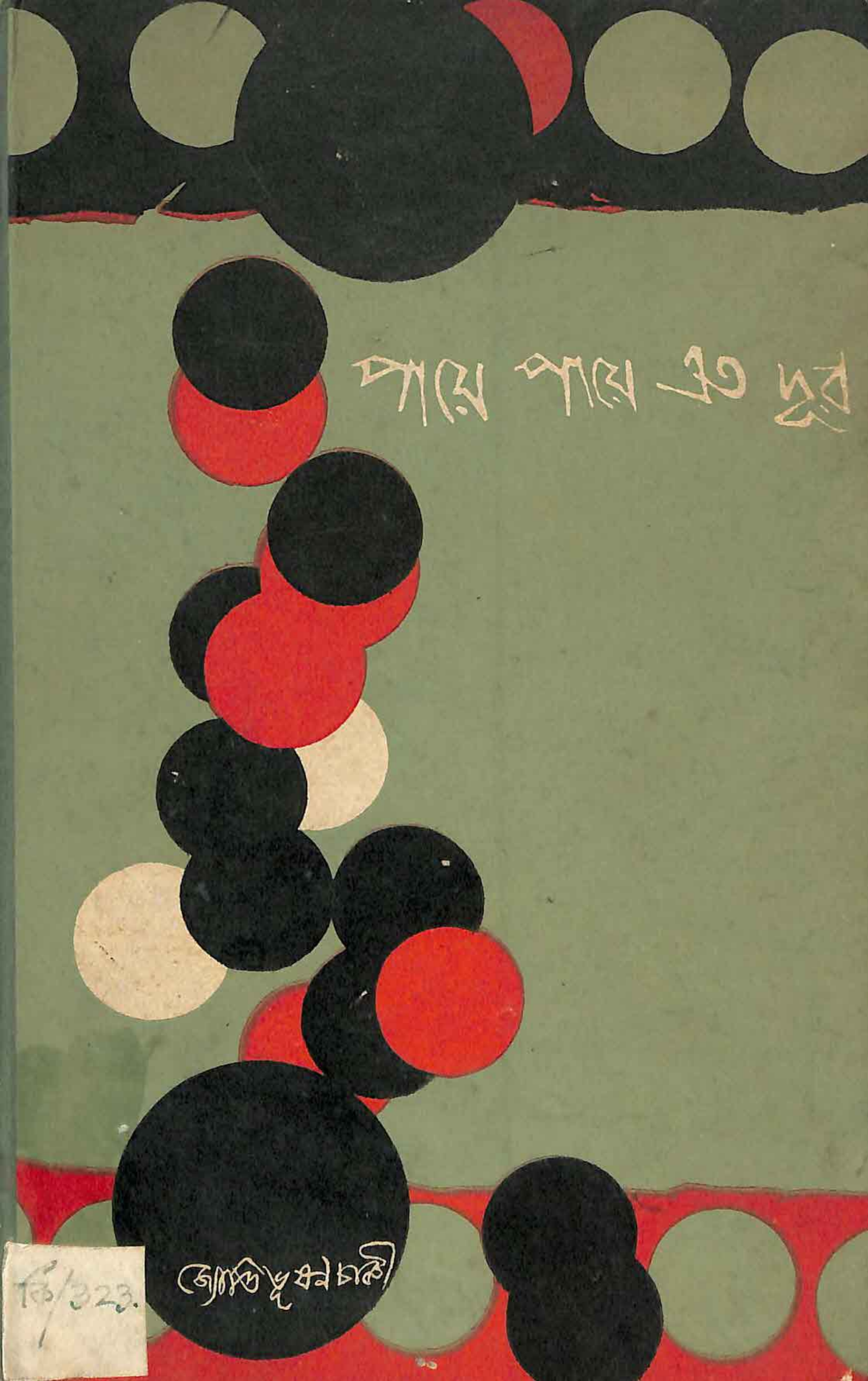


কি/323.

2075
5580
594
F20/323
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

5580
592

পায়ে পায়ে এতদূর

জ্যোতিভূষণ চাকী

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

প্রথম প্রকাশ ॥ ভাদ্র, ১৩৬৭

6.4.94
8140

প্রকাশক

মণি বসু

চিনকো

১৬৭ এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলিকাতা - ১৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

আল্‌ফাবিটা

মুদ্রাকর

শ্রীরথীন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

ওরিয়েণ্ট প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড

৮।১।৩, হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫

দুই টাকা

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

৫৫৪০
১৭৬

শ্রীমুরারিমোহন সেন—

করকমলেষু

একটার পর একটা আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে মানুষের, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আধুনিক যুগে এসেছি আমরা—পায়ে পায়ে এত দূর।

আমাদের অতিপরিচিত, বহুব্যবহৃত অনেক জিনিস আজ আর আমাদের মনে কোন বিস্ময় জাগায় না, কিন্তু এই সব জিনিসের উদ্ভবের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি রোমাঞ্চকর। এমনি কয়েকটি সাধারণ জিনিসের জন্মকথা সহজ করে বলতে চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। এর মধ্যে কয়েকটি কথিকা আকাশবাণী ক'লকাতার 'বিদ্যার্থীদের জন্যে' অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছে। এ কাজে প্রেরণা দিয়েছে ছোটদের জিজ্ঞাসা-ভরা ডাগর চোখ, শিক্ষাব্রতী হিসেবে যে-চোখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করেছি। শেখাবার আয়াস করিনি, গল্প বলেছি শুধু। গল্পের টানে যদি তথ্য তাদের পথ্য হয়ে ওঠে খুশি হব।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৬৭

—লেখক

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

কি কি আছে

2075 16/323



বেলুন

কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে
যেথা খুশি সেথা যাব ভারি মজা হবে।
তাই ফুল একদিন মেলে দিল ডানা
প্রজাপতি হল তারে কে করিবে মানা।

ওড়বার ইচ্ছায় ফুল প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল। প্রদীপের আলোও উড়ি উড়ি করে জোনাকি হয়ে উড়ে গেল। ধোঁয়া-ডানা মেলে জলও মেঘ হয়ে উড়ে গেল আকাশে। মানুষেরও পাখি হয়ে, মেঘ হয়ে, পতঙ্গ হয়ে ওড়বার ইচ্ছেটা পৃথিবীর মতই পুরনো। যতদিন সে সত্যিই আকাশে উড়তে না

পেরেছে ততদিন মেলে দিয়েছে কল্পনার পাখা। নিজের পাখা নেই তাই কল্পনায় পাখা দিয়েছে পরীকে। তেপান্তরের পাথার পেরোনো তো সাধারণ ঘোড়ার কম্ম নয়; চাই পক্ষীরাজ ঘোড়া। পুষ্পকরথ না হলে রামচন্দ্রই বা সীতাকে উদ্ধার করে সাগর পাড়ি দেন কি করে? মহাকাব্যে, পুরাণে, রূপকথায়, গল্পগাথায়, মানুষের ওড়বার ইচ্ছে নানাভাবে রূপ পেয়েছে। পারস্যের রাজা আকাশ-জয়ের কল্পনা করলেন। তাঁর রথের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল চার চারটে বিরাট বাজপাখি—চোখের সামনে ঝুলন্ত মাংস-খণ্ড। মাংসের লোভে বাজপাখিরা উড়ল। রথও সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ল। পাখিরা যখন বুঝল মাংসের নাগাল আর তারা পাবে না তখন ক্লান্ত হয়ে মাটিতে নেমে এল। রাজাও ফিরে এলেন মাটিতে।

ঠিক পাখির মতই পাখা পরে উড়ে পালানোর গল্প আছে গ্রীক রূপকথায়। সে অনেক দিন আগেকার কথা। ক্রীটের রাজা মস্ত কারিগর ডেডালাসকে তাঁর প্রাসাদ তৈরির কাজে লাগালেন। কি এক কারণে ডেডালাসের ওপরে চটে গেলেন রাজা। ডেডালাস আর তার ছেলে ইকারাসকে আটকে রাখলেন কারাগারে। ডেডালাস পাখির পালক মোম দিয়ে এঁটে পাখা বানিয়ে তা জুড়ে নিল নিজের দেহে আর ছেলেটির দেহে। ছেলেকে সাবধান করে দিল: 'খুব উঁচুতে উড়িসনে, আবার খুব নিচুতেও উড়িসনে, আমার পিছু পিছু চলবি।' এর পর তারা উড়ে পালাল দুজনে। ওপরে নীল আকাশ, নিচে নীল সমুদ্র। মাঝখান

দিয়ে উড়ে চলেছে দুজনে। ওড়ার অদ্ভুত আনন্দে ইকারাস বাবার উপদেশ ভুলে গেল। ক্রমশঃই উঁচুতে উড়তে লাগল সে। ফলে সূর্যের উত্তাপে মোম গলে গিয়ে পাখা খুলে গেল। সমুদ্রে ডুবে মরল ইকারাস। ডেডালাস কিন্তু নিরাপদে সিসিলিতে পৌঁছল। মানুষের ওড়ার গল্পে প্রাচীনতম নায়ক হল ডেডালাস।

প্রথম আকাশে ওড়ার ব্যাপারে মানুষ পাখিকেই অনুকরণ করেছে। ডানা জুড়ে কেউ কেউ তা হাত দিয়ে ঘনঘন নাড়াবার চেষ্টা করেছে, কেউ কেউ পা দিয়ে। কেউ কেউ আবার ডানাটাকে নাড়াবার চেষ্টা না করে ডানায় ভর দিয়ে চিলের মত হাওয়ায় ভেসে চলবার চেষ্টা করেছে।

জন ডেমিয়ান নামে একজন ইতালীয় প্রথম ওড়বার চেষ্টা করেন ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জেমসের সভাসদ ছিলেন; তিনি পাখির পালক দিয়ে ডানা তৈরি করে বল্লেন: 'এখান থেকে ফরাসী দেশে যাব।' ষ্টার্লিং ক্যাস্‌লের উঁচু প্রাচীর থেকে তিনি শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু ডানা একেবারে মাটিতে হানা দিলে। আছাড় খেয়ে পা ভাঙলেন। তবু মোটেই ঘাবড়ালেন না, বল্লেন, 'মোরগের পালক দিয়ে ডানা তৈরি করার ফলেই এমন হল, কারণ মোরগেরা উড়তে জানে না ভালো। ঈগলের পালক দিয়ে ডানা গড়লে নিশ্চয়ই পারতাম।'

এর বেশ কিছুদিন পর একজন ফরাসী বল্লেন, 'পাখায় ভর দিয়ে ভেসে চলব।' ঠিক হল বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে নদীর ওপারের বাগানটায় যাবেন হাওয়ায় ভেসে। দেহে শক্ত ডানা

জুড়ে নিয়ে দিলেন ঝাঁপ। সামান্য কিছু দূর গিয়েই মাঝ-নদীতে একটা নৌকোর ওপরে পড়ে তিনিও খোঁড়া হলেন। প্রত্যেক আবিষ্কারের প্রথম দিকের ইতিহাস তো খুঁড়িয়ে চলবারই ইতিহাস, তাই না ?

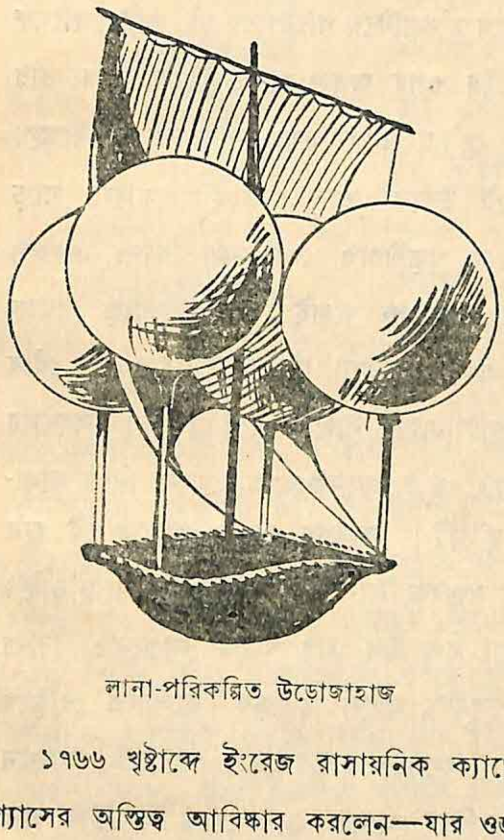
আকাশে ওড়বার প্রথম দিককার চেষ্টায় মানুষ ডানা লাগিয়ে মানুষ-পাখি হয়ে ওড়বার চেষ্টা করেছে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় কারো মাথায় আসেনি। বোরেল্লী নামে ইতালীয় এক অধ্যাপক প্রথম বল্লেন, পাখির মত উড়তে হলে মানুষকে যত বড় ডানা দেহে জুড়তে হবে তত বড় ডানা নাড়াবার শক্তি মানুষের পেশীতে নেই।

মানুষের ওড়বার চেষ্টা শুরু হবার আগে ইতালীর বিশ্ববিখ্যাত মনীষী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি পা-দিয়ে-চালানো-যাবে এমন একটি আকাশ-যানের পরিকল্পনা করেন, পঞ্চদশ শতকে। পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত হলেও অবশ্য আকাশে ওড়া সম্ভব হত না। তবু আকাশ-যানের প্রথম পরিকল্পনা হিসাবে এটি অবশ্যই স্মরণীয়।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সেসকো লানা একটা উড়োজাহাজের পরিকল্পনা করলেন। তামার পাতের বেশ বড় চারটে গোলক জুড়ে দেওয়া হল একটা ঝুড়ির সঙ্গে। গোলক গুলোকে বায়ুর চেয়ে হালকা করার জন্যে বায়ু-শূন্য করে নেবার ব্যবস্থা হল। মাস্তুল ও পাল জুড়ে দেওয়া হল জাহাজের অনুকরণে। জাহাজ যেমন জলে ভাসে, লানা ভাবলেন, তাঁর উড়োজাহাজটিও হাওয়ায় ভাসবে। ভাবাই সার, ও-জাহাজ আর শূন্যে ওঠেনি কখনও।

2073 ক্তি/323
5580/১৭৫.

কারণ, অত পাতলা তামার গোলক থেকে বায়ু টেনে নিলে তা চুপসে যাবারই কথা। কিন্তু এই পরিকল্পনাটির জন্যে অনেকে লানাকেই বেলুনের আবিষ্কারক বলেছেন। বাতাসের চেয়ে হালকা করার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি যে তামার পাতের গোলকগুলো করেছিলেন ওগুলো তো বেলুনেরই সগোত্র।



লানা-পরিকল্পিত উড়োজাহাজ

বাতাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে তখনকার দিনে লোকের কোন ধারণা ছিল না। বাতাসের চেয়েও হালকা কোন গ্যাসের কথা তাদের তখন জানা ছিল না। এই জন্যে লানার উড়োজাহাজ পরিকল্পনার পর বেলুনের সাফল্যে পেঁছতে একশ' বছরেরও বেশি লেগে গেল।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ রাসায়নিক ক্যাভেণ্ডিস্ এমন একটা গ্যাসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন—যার ওজন সাধারণ বাতাসের চেয়ে অনেক কম—এগার ভাগের একভাগ মাত্র। এই গ্যাসকেই এখন আমরা বলি হাইড্রোজেন গ্যাস। এক বছর পরে এডিন-

বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ জোসেফ ব্ল্যাক বল্লেন, বেলুনে হাইড্রোজেন পুরলে তা শূন্যে উঠবে। কিন্তু আকাশে-ওড়া প্রথম বেলুনে এই নতুন-পাওয়া গ্যাস ভরা হয়নি।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দ। শীতের রাত। মঁগলফিয়েদের বাড়িটায় আগুন লাগল নাকি? একটা ঘর তো ধোঁয়ায় ভর্তি! ব্যাপার কি? পড়শীরা ছুটল সব। গিয়ে দেখে মঁগলফিয়ে পরিবারের দুই ভাই জোসেফ আর ষ্টীফেন পাতলা ট্রের ওপর জ্বলন্ত কাঠের টুকরো রেখে তার ওপর কাগজের ঠোঙায় ধোঁয়া ভরে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। ঠোঙাগুলো এক-আধ ফুট উপরে ভেসে থাকছে। আবার পড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা দেখে পড়শীরাও বেশ মজা পেল। একজন বল্ল, ধোঁয়াটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলেই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে ঠোঙাগুলো। দু'ভাই এবারে পাতলা ট্রে-টাই ঠোঙার নিচে বেঁধে দিল। ধোঁয়াভর্তি ঠোঙাটা এবার সিলিঙে গিয়ে ঠেকল। সকলের সে কি আনন্দ! ছোট ছোট অনেকগুলো বেলুন নিয়ে নানা-ভাবে পরীক্ষা করল দু'ভাই। তারপর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন ৩৩ ফিট ব্যাসের একটা মস্তবড় লিনেনের বেলুন ওড়ালো দু'ভাই। বেলুনটায় ধোঁয়া দেওয়া হল উল আর খড়ের আগুনে। দিব্যি আকাশে উঠে গেল বেলুনটা, মাইল দেড়েক ইচ্ছেমত বেড়িয়ে এল। আসলে ধোঁয়া বেলুনকে ওপরে ঠেলে তোলেনি, আগুনে ভেতরের বায়ু গরম হয়ে গিয়ে অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল আর বাইরের বাতাসের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার মাটিতে নেমে এল বেলুনটা। এই হল প্রথম

উড়ন্ত যান। একে বলা হল আগুনে-বেলুন। বেলুন নামটাও দু'ভাই দিয়েছিল।

এই সাফল্যের সংবাদ যখন প্যারীতে এল তখন অধ্যাপক চার্লসের তত্ত্বাবধানে রবার্ট পরিবারের দু'ভাই ১৩ ফিট ব্যাসের একটা বেলুন গড়লেন সিল্ক দিয়ে। বেলুনটায় হাইড্রোজেনগ্যাস ভরা হল। ঐ বছরেই ২৭শে আগষ্ট প্যারীর একটি মাঠ থেকে ছাড়া হল বেলুনটি। ১৫ মাইল আকাশে বেড়িয়ে গ্রামের মাটিতে নামল বেলুনটি। গ্রামের লোকেরা তো ভয়ে অস্থির—এটা আবার কিরে বাবা!



মঁগলফিয়ে বেলুন

এইবার শুরু হল আগুনে-বেলুন আর গ্যাস-বেলুনের প্রতিযোগিতা। ১৯শে সেপ্টেম্বর জোসেফ মঁগলফিয়ে ভার্সাইয়ে ফরাসীদের রাজবাড়ির সামনে এক বেলুন ওড়ালেন। একটা ভেড়া, একটা মোরগ, আর একটা হাঁসকে নিয়ে বেলুনটি দেড় হাজার ফিট উপরে উঠল। ইতিহাসে ওরাই হল আকাশপথের প্রথম যাত্রী। বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে তখন লোকের কোন ধারণাই ছিলনা। ভেড়া, মোরগ আর হাঁসটার ভবিষ্যৎ ভেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্লেন অনেকেই। আধুনিক যুগে আমরা যেমন ফেলেছিলাম লাইকার জন্যে। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে ওরা বহাল তবিয়তে

ফিরে এল। ওরা নিরাপদে ফিরে এসে মানুষকে সাহস দিল।

প্রথমে ঠিক হল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দু'জন আসামীকে ওপরে পাঠানো হবে। এমনিতেই তো ওরা মরত, বেলুনে চেপেই না হয় মরবে। কিন্তু শূন্যপথে প্রথম মানুষ যাত্রীর সম্মান পাবে দু'জন খুনে আসামী! পিলেৎর্ দ্য রোজিয়ে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারলেন না। আকাশপথে প্রথম মানুষ-যাত্রী হলেন তিনি। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মাটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি বেলুনে উঠলেন তিনি। আরও কিছু পরীক্ষার পর মারকুইস্ দ্য আরল্যান্দেস্‌কে নিয়ে তিনি একটি বাঁধন-ছাড়া বেলুনে শূন্যে পাড়ি দিলেন। প্যারীর উপরে ২০ মিনিটে ৫ মাইল বেড়ালেন। ঐ বছরেই ডিসেম্বরে অধ্যাপক চার্লস এবং রবার্ট ভাইদের একজন প্যারী থেকে নেস্‌লে—প্রায় ২৭ মাইল পাড়ি দিলেন। অধ্যাপক চার্লসই প্রথম বেলুনে 'কোল-গ্যাস' ব্যবহার করলেন। বেলুনকে ইচ্ছেমত ওপর-নিচ করবার উপায়ও তিনিই বার করলেন। কিন্তু ইচ্ছে মত বিশেষ কোন একদিকে এগিয়ে যাওয়া তখনও সম্ভব হল না।

ফরাসীদেশের পর বেলুন-চর্চা শুরু হল গ্রেটব্রিটেনে। গ্রেটব্রিটেনের প্রথম বেলুন-আরোহী হলেন জেমস টাইটলার। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তিনি এডিনবরা থেকে বেলুনে চেপে মাইল দেড়েক শূন্যে ভ্রমণ করলেন। ঐ বছরই ১৫ই সেপ্টেম্বরে ভিন্ সেন্‌জো লুনার্দি দু'লক্ষ দর্শকের সামনে শূন্যে উড়লেন। প্রত্যেকের মুখেই বেলুনের কথা। ডাঃ জনসন মন্তব্য করলেন ঃ

2073 · ক/৩২

'যতক্ষণ একে আমরা ইচ্ছেমত চালাতে না পারছি ততক্ষণ একে দিয়ে কিছু হবে না।' কিছু হোক আর না হোক বেলুনে চড়া ক্রমেই বেড়ে চল্ল। একজন ফরাসী ডোভার থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছরেই পিলেৎর্ ইংলিশ চ্যানেল পার হতে গিয়ে প্রাণ হারালেন।

এরপর চলতে লাগল বেলুনকে ইচ্ছেমত নানাদিকে চালাবার চেষ্টা। ভিয়েনার জেকব্ দেঘেন এই উদ্দেশ্যে একটা ডানা-জোড়া পাখি-বেলুন বানালেন। দেখবার জন্যে মাঠে লোক জড়ো হল। জেকব মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপ্টালেন কিন্তু বেলুনটা নড়লই না। হতাশ জনতা মারমুখী হল। জেকব পালালেন, উড়ে নয়, দৌড়ে।

এরপর বেলুনে মোটরের সাহায্যে স্ক্রু-প্রপেলার চালিয়ে দিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চল্ল। এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন গিফার্ড। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লা-ফ্রাঁস বেলুন যেখান থেকে উড়েছিল চালকের ইচ্ছামত আবার সেখানেই ফিরে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও আকাশ-জয়ের পথে অনেক ধাপ এগিয়ে গেলাম।

আজ আকাশ-যানে ঘণ্টায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়েও আমাদের তৃপ্তি নেই, মহাকাশ-জয়ের স্বপ্ন দেখছি আমরা। মানুষের তৈরি গ্রহ উপগ্রহ আজ যখন মহাজাগতিক রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে, তখন বেলুন আর কিছু করুক না করুক, অন্ততঃ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার খবরটুকু বয়ে আনুক। আর তারও যদি প্রয়োজন না থাকে তবে ছোট্টটি হয়ে ছোট্টদের বুকের বাতাস বয়ে তাদেরি মনের আকাশে খেলা করুক।

টাঁকশাল

ছোট্ট বুলু পকেট থেকে একটা চক্‌চকে দশ-নয়াপয়সা বের করে চিনেবাদাম কিনছে : 'উঁহু, হল না। দশ-নয়াপয়সায় অতটুকু বাদাম ?' বাদামওয়ালা একটু হেসে আরও দুচারটে পুরে দেয় ঠোঙায়।

আজকে একটা ছোট্ট ছেলেও জানে পয়সা দিয়ে সে ইচ্ছে মত জিনিস কিনতে পারে। আর কত পয়সায় কি, বা কতটুকু জিনিস পাওয়া যেতে পারে তার মোটামুটি একটা ধারণাও তার আছে। কিন্তু পুরনো দিনে যখন টাকা পয়সার চল ছিলনা, তখন কেনাকাটা ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। শ্রম, পণ্য বা গো-ধনের বিনিময়ে তখন বেচা-কেনা চলত। একেই বলা হয় বার্টার বা বিনিময় প্রথা। ধর রামের একটা লাঙলের দরকার। সে হয়ত তার একটা বলদের বিনিময়ে শ্যামের কাছ থেকে একটা লাঙল পেতে পারে। কিন্তু শ্যামের যদি বলদের প্রয়োজন না থাকে তবে মুশকিল। তখন আবার রামকে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে যে লাঙল বেচতে চায় এবং যার বলদের চাহিদা আছে। আবার লাঙলের চেয়ে যদি বলদের দাম বেশি হয় তবে বলদটাকে ভেঙে তো আর খুচরো করা যাবে না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে মানুষ বেশ কিছুদিন ধান, চাল,

লবণ, চিনি, তামাক ইত্যাদিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এসব মাধ্যমও অচল হয়ে পড়ল। তখন মানুষ এমন একটা মাধ্যমের কথা ভাবল সকলের কাছেই যার সমান মূল্য আর যার মাপকাঠিতে অন্য সব জিনিসের মূল্যও ঠিক করা যায়। সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতুই হল এই মাধ্যম। ধাতুপিণ্ডের সাহায্যে শুরু হল কেনা-বেচা। কিন্তু এতেও অসুবিধা দেখা দিল। কারণ প্রত্যেক বারই এই সব ধাতুপিণ্ডগুলোকে ওজন করে দেখতে হত। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবলে এই অসুবিধাও কাটিয়ে উঠল। চালু হল নির্দিষ্ট ওজন আর নির্দিষ্ট আকারের ধাতু-মুদ্রা।

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত লিডিয়াতে গ্রীকেরাই সর্ব প্রথম মুদ্রা তৈরি করে। মুদ্রা তৈরির রেওয়াজ গ্রীকদের কাছ থেকে এল ইতালী ও ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে। তারপর পারস্য ও ভারতে। পাশ্চাত্যদেশে মুদ্রার প্রচলন হবার কিছু পরে চীনেও মুদ্রা চালু হয়। চীন স্বাধীনভাবেই এই মুদ্রাংকন আরম্ভ করে, কারো অনুকরণে নয়। চীন থেকে এই রেওয়াজ আসে জাপানে ও কোরিয়ায়। রোমানরা আসবার আগেই বৃটেন মুদ্রা তৈরি করেছিল।

প্রাচীন রোমানরা প্রথমে জুনো মনিটার (Juno Moneta) মন্দিরে মুদ্রা তৈরি করেছিল। টাঁকশালের ইংরেজী প্রতিশব্দ Mint এই Moneta শব্দ থেকেই এসেছে।

টাঁকশাল বলতে এখন যা বোঝায় তখনকার টাঁকশাল কিন্তু

তা ছিলনা। তখনকার টাঁকশাল ছিল কামারশালের মতই। কামারশালে যেমন করে ধাতুর জিনিস তৈরি হয়, মুদ্রাও তৈরি হত সেইভাবে। দুটো ছাঁচের মধ্যে ধাতুর চাক্‌তিটা রেখে



একটি প্রাচীন গ্রীক মুদ্রা (খৃঃ পূঃ ৪২০)

নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ি পিটে মুদ্রা তৈরি হত। ষোড়শ শতাব্দী অবধি অনেক দেশে এইভাবে মুদ্রা তৈরি হত।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মুদ্রায় সিংহ পক্ষীরাজ ঘোড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি জন্তু জানোয়ারের ছবি থাকত। ওপিঠে থাকত আঙুর, বার্লি ইত্যাদি শস্যের গুচ্ছ। আলেকজাণ্ডারের মুদ্রাতেই প্রথম তাঁর মূর্তি অঙ্কিত হয়। পরবর্তীকালে প্রায় সব দেশের মুদ্রাতেই রাজার মাথা আঁকবার রেওয়াজ এ থেকেই এসেছে। এই সব মুদ্রা প্রথমে সোনা বা রূপা দিয়ে তৈরি হত। তারপর তামা,

ব্রোঞ্জ ও আরও নানারকমের মিশ্র ধাতুর ব্যবহার হয়। তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি মুদ্রাও তখন বেশ বড় আকারের হত, কারণ মুদ্রায় অঙ্কিত মূল্য মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু-মূল্যের সমান হত। এখন আর আমাদের এমনটা করবার দরকার হয় না। যে মুদ্রা আমরা এখন ব্যবহার করি তাকে বলে প্রতীক-মুদ্রা। একটা নিকেলের টাকা করতে যতটুকু নিকেল লাগে তার দাম এক টাকার চেয়ে অনেক কম। কাজেই আমরা বলতে পারি নিকেলের মূল্য একটাকা নয়, টাকাটা হল একটাকা মূল্যের প্রতীক।

গ্রীক ও রোমানদের হাজার বছরের সাধনা আধুনিক মুদ্রা-যন্ত্রের গোড়াপত্তন করেছে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মুদ্রা তৈরি হয় তা আবিষ্কৃত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহাম-নিবাসী বোল্টন সাহেব একটি বাষ্পচলিত যন্ত্র তৈরি করেন। আর এই যন্ত্রটি ক্রমশঃ উন্নততর হয়ে বোল্টনযন্ত্র নামে বিখ্যাত হয়েছে।

মুদ্রা তৈরি করবার আধুনিক পদ্ধতি সংক্ষেপে বলছি।

ধাতু আসে প্রথমে পিণ্ড আকারে। তাকে গলিয়ে 'বার' বা ধাতু-দণ্ডে পরিণত করা হয়। এরপর রোলারের চাপে একে প্রয়োজন মত পুরু ধাতুর পাতে পরিণত করা হয়। এই পাতগুলো থেকেই আর একটি মেশিনে ছোট ছোট চাক্‌তি তৈরি হয়। তারপর এই চাক্‌তিগুলোকে বৈদ্যুতিক উত্তাপে গরম করে আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক উত্তাপে ফিরিয়ে আনা হয়। এইবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এগুলোকে পরিষ্কার করে নিয়ে আরেকটি

SIC TRAINING COLLEGE BANIPUR.

মেশিনে দেওয়া হয়। এই মেশিনে বিশেষ প্রক্রিয়ায় চাক্‌তি-গুলির পরিধি দুপিঠেই একটু উঁচু হয়ে ওঠে। কোন কোন মুদ্রায় পরিধিতে বিন্দু বা খাঁজ কাটা দাগ তুলে দেওয়া হয়। এতে মুদ্রাটি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হতে পারে না। সবশেষে চাক্‌তিগুলোকে ছাপ মারবার মেশিনে দেওয়া হয়।

এই মেশিনে একটি ছাঁচের ওপর চাক্‌তিটা পড়বা-মাত্র ওপর থেকে আরেকটি ছাঁচ তার ওপরে সজোরে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তা গিয়ে পড়ে একটি পাত্রের মধ্যে। এইভাবে মিনিটে প্রায় চারশ' চাক্‌তি মুদ্রিত হতে পারে। এরপর মুদ্রাগুলির ওজন পরীক্ষা করা হয় বিশেষ একটি যন্ত্রে। যন্ত্রটির নাম অটোমেটিক ব্যালান্স। ওজনের সামান্য তারতম্য হলেই ধরা পড়ে এই যন্ত্রে। মুদ্রা তৈরির প্রতিটি পর্যায়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন।

পৃথিবীতে মোট ১৪০টি দেশ নিজস্ব মুদ্রা চালু করেছে। কিন্তু খুব কম দেশেই টাঁকশাল আছে। যে সব দেশের টাঁকশাল নেই তারা অন্য দেশ থেকে টাকা তৈরি করে আনে।

আধুনিক টাঁকশাল বলতে যা বোঝায় তা ভারতে প্রথম স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে, কলকাতায়। ক্রমশঃ ভাল যন্ত্রপাতি বসিয়ে একে উন্নত করা হয়। ১৮২৯ সালে ১লা আগষ্ট এই টাঁকশাল থেকে নিয়মিত মুদ্রা তৈরি হতে থাকে। এই উন্নতির মূলে ছিলেন উইলিয়ম ফরবেল্‌। এই টাঁকশালের অধ্যক্ষও ছিলেন তিনি।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

এর অল্পদিন পরে বোম্বাই সহরে আরেকটি টাঁকশাল তৈরি হল। প্রায় একশ বছর ধরে এই দুই টাঁকশালই আমাদের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে।

এরপরে মাদ্রাজেও একটি টাঁকশাল তৈরি হয়। এখন কলকাতার আলিপুরের টাঁকশাল আর বোম্বাইয়ের টাঁকশাল নতুন ধরণের মুদ্রা অর্থাৎ দশমিক মুদ্রা তৈরির সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে। ভারতের কোটি কোটি লোকের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অগণিত মুদ্রার প্রয়োজন। এ-ছাড়া অন্যান্য দেশের মুদ্রা তৈরি করবার দায়িত্ব আছে।

আশার কথা আলিপুরের টাঁকশাল আর বোম্বাইয়ের টাঁক-শাল এ দায়িত্ব বহনে সমর্থ। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে প্রায় ১০৫ কোটি মুদ্রা তৈরি হয়েছিল। অন্যান্য দেশে এই হারে মুদ্রা তৈরি হয় কিনা সন্দেহ।

টাঁকশালে কাগজের নোট ছাপানো হয় না। নোট ছাপাবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। তবে টাঁকশালে মুদ্রা ছাড়াও নানারকমের মেডাল্ বা পদক তৈরি হয়। এছাড়া বাটখারাও তৈরি হয় টাঁকশালে। বাটখারা ইত্যাদির ওজন ঠিক আছে কিনা তা পরখ করে দেখাও টাকশালের কাজ।

টাঁকশালকে একটি কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভেবে দেখ ছোট্ট ছোট্ট মুদ্রায় কত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে যে সব শিল্পীরা এই সব নক্সার পরিকল্পনা করেন এবং ছাঁচ তৈরি করেন তাঁদের কৃতিত্ব কম নয়। প্রাচীন গ্রীক মুদ্রায়

6.4.94

নক্সার সঙ্গে শিল্পীর নামও খোদাই করা থাকতো অনেক ক্ষেত্রে। ভালো নক্সার জন্যে শিল্পী পুরস্কৃতও হতেন। আমাদের দেশেও এই রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। মুদ্রায় আঁকা নক্সা বা চিত্র বিশেষ মূল্যবান। কারণ এই সব চিত্রকর্ম থেকে দেশের রীতি নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেককিছু জানবার সুযোগ পাওয়া যায়। ইতিহাসের অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে মুদ্রা থেকে। আমাদের এখনকার মুদ্রা যদি হাজার হাজার বছর পরে প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে পড়ে, তাঁরা অশোকচক্র দেখে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করবেন ভারত শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী।

প্রাচীন ভারতে ধাতুর তৈরি অঙ্ক-চিহ্নিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল। রুপোর মুদ্রার নাম ছিল পুরাণ বা ধরণ আর তামার মুদ্রার নাম কার্ষাপণ। শুধু কতগুলো গাছ, নদী, চক্র, সূর্য ইত্যাদি নক্সা একপিঠে, কখনও বা দুইপিঠেই মুদ্রিত হত। এরকমের চার পাঁচশ অঙ্ক-চিহ্ন এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। এ গুলোর তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হয়তো একেকটি রাজবংশের একেকটি কুল-চিহ্ন এগুলো। বনিক্‌সম্প্রদায়ের মুদ্রাতেও পৃথক্ পৃথক্ অঙ্ক থাকত। এগুলো ছিল তাদের ট্রেড্‌-মার্ক। প্রাচীন মুদ্রার স্বস্তিকা নন্দিপাদ ইত্যাদি কয়েকটি অঙ্কচিহ্ন এখন শুভচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত



প্রাচীন ভারতের মুদ্রার ব্যবহৃত
কয়েকটি অঙ্ক-চিহ্ন

ক. পর্বত ও অর্ধ চন্দ্র
অনেকে মনে করেন এটি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের চিহ্ন
খ. স্বস্তিক (শুভচিহ্ন)
গ. নন্দিপাদ ,,
ঘ. নন্দিপাদের সহজ আকার

হয়। এই সব চিহ্নের তাৎপর্য তখন কি ছিল তা নিয়ে গবেষণা চলছে এখনও।

কড়ি থেকে নয়াপয়সা পর্যন্ত ইতিহাসের পদচিহ্ন আঁকা আছে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মুদ্রায়। একদিন হয়তো বিগতদিনের বোবা মুদ্রা কথা কয়ে উঠবে তোমাদেরই কানে কানে।

ডাকঘর

চিঠি! কী মিষ্টি এই সামান্য কথাটুকু! কত সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার ঢেউ তুলে দেশদেশান্তরে ছুটে চলে চিঠি। ছোট্ট ছেলেটিও আজ জানে চিঠি কি। পিওন এলে জানালার ধারে ছুটে যায় খোকাখুকু। পিওনের হাত থেকে প্রথমে চিঠিটা নিয়ে বড়দের হাতে তুলে দিয়ে কী খুশিই না হয় ওরা! আজকে খোকাখুকুও খাতায় আঁচড় কাটতে শিখেই চিঠি লিখতে চায়। বাবা বিদেশে। চিঠি এলো তাঁর কাছে, খোকাখুকুর চিঠি।

খোকার চিঠি পেয়ে তো বাবা খুশি
পাতাটি জুড়ে এঁকেছে শুধু পুষি।
খুকুর চিঠি পেয়ে তো বাবা থ
পাতাটি জুড়ে লিখেছে শুধু 'অ'॥

চিঠি পাওয়া আর চিঠি লেখা আজ কত সহজ হয়েছে, কিন্তু এই চিঠির যুগে পৌঁছতে কত যুগ কেটেছে আমাদের। মানুষ যখন খুবই ছেলেমানুষ তখনও একজনের মনের কথা অন্যকে জানাবার কত চেষ্টা করেছে তারা—দড়িতে গিট বেঁধে, মাটিতে পাথরে আঁচড় কেটে, নানা রকমের আওয়াজ তুলে, আগুন জ্বালিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবর দেবার চেষ্টা করেছে আপনজনকে। তারপর মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন মনের কথা অন্যকে জানানো কত সহজ হয়ে গেল।

মানুষ প্রথম চিঠি লিখেছে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। ব্যাবিলনীয় ভাষায় লেখা এমন চিঠি পাওয়া গেছে মিশরে। চিঠিগুলো সম্ভবতঃ ব্যাবিলনের রাজা প্রথম সারগনের সময়ে লেখা। চিঠি লেখা হত মাটির ফলকে। খামও ছিল মাটির। খামের ওপর ঠিকানা লেখা থাকত মালিকের। চিঠির মালিক মাটির খাম ভেঙে চিঠি বের করে নিতেন। ক্রীতদাসেরা পত্রবাহকের কাজ করত। মিশরের একটি স্তূপে একটি পত্রবাহকের খোদাইকরা চিত্র পাওয়া গেছে আর সেই সঙ্গে তার জীবন-কথাও:

'চিঠি নিয়ে রওনা হবার আগে সে ছেলেদের বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে যায়। বন্যজন্তু আর শত্রুদের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাকে। যদি ফিরেও আসে লাভ নেই। আবার তাকে ঝুঁকি নিয়ে রওনা হতে হবে দূর দেশে।'

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাসের লেখা থেকে জানা যায় পারস্য সম্রাট সাইরাস আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় সেনা-বিভাগের মধ্যে ডাক-ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। পত্রবাহকদের সম্বন্ধে হেরোডটাস বলেছেন:

'ঝড়-জল শীত-গ্রীষ্ম সব কিছু উপেক্ষা করে তারা ছুটত খবর নিয়ে।'

দূত মারফৎ সংবাদ আদানপ্রদান করবার রীতি ভারতবর্ষেও সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগে রাজারা সর্বদাই দূত পাঠিয়ে অন্য রাজকর্মচারী বা অন্যান্য রাজাদের

সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পৌরাণিকযুগে জনসাধারণের মধ্যে কোন পত্র-যোগ ছিল না। যেটুকু হত অত্যন্ত গোপনে। সেকালে অনেক দেশেই সাধারণের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান নিষিদ্ধ ছিল।

তখন যানবাহনের তো অতটা উন্নতি হয়নি, পথঘাটও ছিল দুর্গম। দুর্গম পথ পেরিয়ে মানুষদূত আর কত দূর যেতে পারে? খবর পাঠিয়ে জবাব মিলতেই বছর গড়িয়ে যেত। তাই উড়ন্ত পাখির দিকে তাকিয়ে মানুষ ভেবেছে যদি পাখিকে কাজে লাগানো যায় খবর বইবার কাজে। নানা রকমের পাখি নিয়ে চেষ্টা চলল। শেষে দেখা গেল পায়রাদের দিয়ে একাজ বেশ ভাল ভাবে করানো যেতে পারে। নানা দেশেই পায়রা ব্যবহার করেছে রাজারা।

চীনদেশে পায়রার পালকের সঙ্গে চিঠি-ভরা ছোট সরু চোঙা বেঁধে দেওয়া হত। পায়ে দেওয়া হত ঘুন্টি। ঘুন্টির আওয়াজ শুনে কাছে ঘেঁসত না অন্য পাখিরা। ঘুন্টির বদলে বাঁশিও বেঁধে দেওয়া হত পায়রার পালকে। বাতাস লেগে আপনা থেকেই বাঁশি বাজতে থাকত।

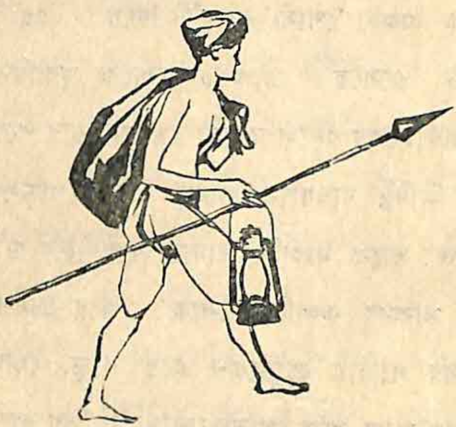
পায়রাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম এয়ার-মেল। ভারতেও চিঠি বইবার কাজে পায়রা ব্যবহার করা হয়েছে। মহাভারতের যুগে নলদময়ন্তী পায়রাকে কাজে লাগিয়েছে চিঠি-পত্র আদানপ্রদান করার ব্যাপারে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শিক্ষিত পায়রা দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে প্রদেশপালদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

পায়রার ব্যবহার একটু-আধটু চলত বটে, তবে না বল্লেও চলে, ডাকবাহী মানুষের উপরেই বেশি নির্ভর করতে হত।

কিন্তু একজন লোক তো দীর্ঘপথ সমান জোরে ছুটতে পারে না। তাই একজনের বদলে বেশ কয়েকজনের সাহায্য নেওয়া হল। নির্দিষ্ট ব্যবধানে একজন দাঁড়িয়ে রইল। একজন দৌড়ে গিয়ে আর একজনকে চিঠির থলিটা দিল, সে তক্ষুনি দৌড়ল তৃতীয়জনকে পোঁছে দিতে, সে আবার ছুটল চতুর্থজনকে পোঁছে দিতে। এই ভাবে ডাক চলে গেল দূর থেকে দূরে। ব্যাপারটা দাঁড়াল ঠিক 'রীলে রেসে'র মত। নির্দিষ্ট ব্যবধানে যে জায়গা-গুলোতে ডাকবাহীরা দাঁড়িয়ে থাকত সেই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করা হল এক একটা 'পোস্ট' বা খুঁটি দিয়ে। এর থেকেই পোস্ট-অফিস কথাটা এসেছে। ডাক চলাচলকে ত্বরান্বিত করার জন্যে পদাতিক পত্রবাহকের বদলে ক্রমশঃ ঘোড়সওয়ার পত্রবাহক নিয়োগ করা হল। নির্দিষ্ট ব্যবধানে ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার যেখানে অপেক্ষা করত তাকে মারাঠী ভাষায় বলা হত ডাঁক বা ডাক। এর থেকেই ডাকঘর কথাটি এসেছে। পরে ক্রমশঃ ঐ জায়গায় অফিস বা ঘর থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ঘোড়ার দানাপানি যোগান দেবার জন্যে আর পোস্টম্যানদের বিভিন্ন প্রয়োজনে। শুধু তাই নয়। ভ্রমণকারীরাও ঐ ডাকঘরেই বিশ্রাম করত আগে থেকে খবর দিয়ে। ডাকবাংলো কথাটির উৎস এইখানে।

আমাদের দেশে চতুর্দশ শতকে পদাতিক ও অশ্বারোহী দুরকমের পত্রবাহকই ছিল মহম্মদ বিন্ তুঘলকের আমলে। শেরশাহের আমলে

ঘোড়ার ডাকের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়। শেরশাহ বাংলার সোনারং থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত দু'হাজার মাইল এক রাস্তা তৈরি করেছিলেন। এই রাস্তায় নিয়মিত ডাক চলাচল করত। আকবরের সময়ে মুঘলসাম্রাজ্যের সর্বত্র ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। আকবর যে নূতন ডাকব্যবস্থা প্রচলন করেন তার মধ্যে ডাক-মেব্ড়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সব জায়গাতেই মেব্ড়াদের আড্ডা ছিল। মেব্ড়ারা মেবাটের অধিবাসী। তারা খুব জোরে দৌড়তে পারত। অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করার ব্যাপারে আকবর মেব্ড়াদের ওপর খুব নির্ভর করতেন। আকবর প্রধান রাস্তার দশ মাইল পরপর একটি করে ডাকঘর বসিয়েছিলেন।



রানার

এই সব ডাকঘর থেকে ডাক নিয়ে যাবার কাজে তিনি তুর্কী ঘোড়াদের সাহায্য নিতেন। পদাতিক ডাকবাহীদের মুঘলযুগে বলা হত ডাকহরকরা।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের ব্যাবসার কাজে ডাকহরকরাদের লাগালেন। ক্রমে তাঁরা ডাকচলাচলের ব্যবস্থাটা তাঁদের নিজের হাতেই রাখা দরকার মনে করেন। ১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইব প্রথমে সরকারী ডাক চালু করেন। অবশ্য সরকারী চিঠিপত্রই শুধু পাঠানো যেত তখন। আট বছর পরে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সাধারণ লোকও ডাকের সাহায্য নিতে পারবে বলে ঠিক হল। অবশ্য ডাক চলাচল তখন বড় বড় কয়েকটি সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মাশুলও ছিল খুব বেশি। একটা এক তোলা ওজনের চিঠি কলকাতা থেকে বোম্বে পাঠাতে একটাকা লাগত।

ওয়ারেন হেস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিসের সময়ে একটা চিঠির জবাব ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসতে প্রায় এক বছর লেগে যেত। তখন জাহাজ যেত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। এরপর সুয়েজের পথে যাতায়াত শুরু হওয়ায় সময় সংক্ষেপ হল অনেক। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগও হল আরও ঘনিষ্ঠ।

আমাদের দেশে লর্ড ডালহৌসীর সময় ডাকব্যবস্থার অনেক উন্নতি হল। ডাকব্যবস্থার উন্নতি রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের উন্নতির ওপর নির্ভর করে। ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলপথ খোলা হয়। ডাকব্যবস্থার ইতিহাসে এ হল সম্ভাবনার নূতন দিগন্ত।

১৮৫৪ সাল ভারতের ডাকঘরের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই বছরেই ভারতে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়। পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়েছিল ১৮৪০ সালে, ইংলণ্ডে—একপেনি

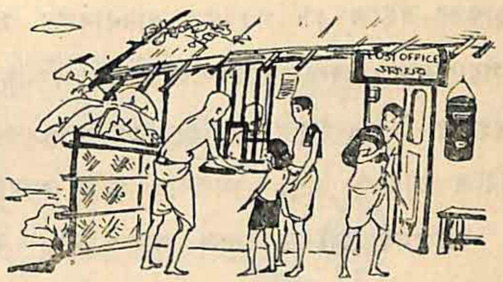
দামের টিকিট, নাম পেনি ব্ল্যাক। টিকিটের ডিজাইন করেছিলেন রাউল্যাণ্ড হিল। ইনিই প্রথম দূরত্বনির্বিশেষে একরকমের মাশুল চালু করবার পরামর্শ দেন।

প্রথম পোস্টকার্ড চালু হয়েছিল ১৮৭০, অস্ট্রিয়ায়। ভারতে প্রথম পোস্টকার্ড চালু হয় ১৮৭৯ সালে। তখন পোস্টকার্ডের দাম ছিল এক পয়সা। এতে জনসাধারণের সুবিধা হল অনেক। তবে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতে অভ্যস্ত হতে বেশ সময় লেগেছিল আমাদের। পোস্টকার্ডের লেখা যাতে অন্যে পড়তে না পারে তার জন্যে লেখকরা এমন সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখতে লাগল যে চিঠির মালিকের পক্ষেও তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। আবার পোস্টকার্ডের কোন্ দিকটায় ঠিকানা লিখতে হবে তা নিয়েও গণ্ডগোল। এখন যেমন ঠিকানা লেখার জন্যে পোস্টকার্ডের এক পিঠের অর্ধেকটা দাগ টেনে নির্দিষ্ট করা থাকে তখন তা থাকত না। একটা পূরো পৃষ্ঠাই ঠিকানা লেখবার জন্যে ছিল। চিঠির আদানপ্রদান বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। গ্রামসর্বস্ব দেশে ডাকহরকরাদের ওপরেই নির্ভর করা হত। ডাকহরকরাদের ঝুঁকি ছিল অনেক। একটা ঘটনা বলি শোন।

গ্রামে বাঘের উপদ্রব। গরুটা ছাগলটা প্রায়ই নিয়ে যাচ্ছে। রানার চলেছে সেই গ্রাম দিয়ে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। গ্রামের লোকেরা রানারকে মানা করল ভিনগাঁয়ে যেতে : 'রাতটা এখানে থেকেই যাও গো. ভোরের বেলা রওনা হয়ো।' কিন্তু রানার তো থামতে পারে না। সে গ্রামের চৌকিদারকে

অনুরোধ করল তার সঙ্গে যাবার জন্যে। চৌকিদার রাজী হল। দুজনে চলেছে। আগে রানার, তার পিছু পিছু চৌকিদার। বাঘটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল। ক্রোশখানেক যেতেই হঠাৎ বাঘটা ঝোপ থেকে হালুম করে লাফিয়ে পড়ল রানারের ঘাড়ের ওপর। তারপর তাকে ধরে নিয়ে একলাফে উধাও। চৌকিদার অবশ্য বেঁচে গেল। সে রানারের হয়ে ডাক পৌঁছে দিল।

এমন কত ডাকহরকরার জীবন বিপন্ন হয়েছে। তবু খবরের বোঝা পিঠে নিয়ে ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজিয়ে হাতে লণ্ঠন রানার ছুটে চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে।



গ্রামের ডাকঘর

গ্রামে পৌঁছে আগে কার দিনে রানাররা তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করত বিউগল্ বাজিয়ে। আওয়াজ শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসত, যে যার চিঠি নিয়ে যেত। আগে রানাররা সরাসরি গ্রামে এসে চিঠি দিত। ক্রমশঃ পোস্টঅফিসের সংখ্যা যখন বাড়ল তখন ডাক আসতে লাগল এক পোস্ট অফিস থেকে আর এক পোস্ট অফিসে। তারপর সেখান থেকে পিওন দিয়ে চিঠি বিলির ব্যবস্থা হল।

তখনকার দিনে চিঠি বিলি করাও ছিল এক সমস্যা। কোন কোন চিঠিতে শুধু গ্রাহকের নাম ছাড়া আর কিছু থাকত না ঃ

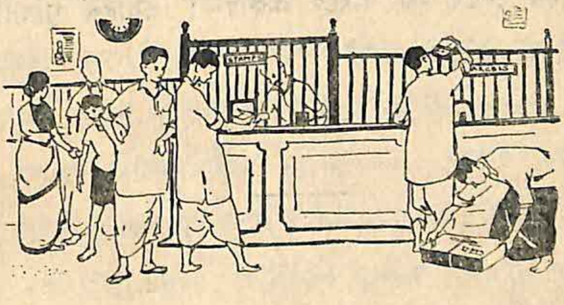
যেমন, 'পরম পূজনীয় কনিষ্ঠ খুল্লতাত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাদপদ্মে পেঁছে।' অথবা, 'মহামান্য পরম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা দরিদ্র বান্ধব প্রভু মদীয় হিতকারী মুন্সী মানিক চাঁদ সমীপে পেঁছে।' এখানে নামটি বিশেষণমণ্ডিত হলেও, ধামের নামগন্ধও নাই। বুঝতেই পারছ চিঠি বিলির ক্রিয়াটাও হত অসমাপিকা।

ঠিকানা আবার অনেক সময় খুবই জটিল হত। চিঠি যাতে মালিক ছাড়া আর কেউ না পড়ে তার জন্যে অনুরোধও থাকত ঠিকানায়। একটা নমুনা শোন: 'মদীয় হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য পরম সৌভাগ্যবান্ বাবু শিবনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয় সমীপেষু। হাসানাবাদ ডাকঘর হইতে ২৪ পরগণার রামনাথপুর গ্রামে ভাগ্যবান্ বাবু পিয়ারীনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ইহা পেঁছাইতে হইবে। পিওন মহাশয় ঠিকানা-লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও হাতে এই পত্র বিলি করিবেন না। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ।'

গ্রামের চিঠিপত্র রোজ আসত না। অনেক গ্রামে সপ্তাহে একবার, কোন কোন গ্রামে পনেরো দিনে একবার ডাক আসত। চিঠি বিলির ব্যাপারে গ্রামের হাটবারগুলো ছিল প্রশস্ত। তরিতরকারির থলির সঙ্গে চিঠির থলিও হাটে আসত। তারপর যার যার চিঠি তাকে দেওয়া হত। গ্রামের লোকই ডাক-পিওনের কাজ করত। তাতে কাজের সুবিধা হত।

গ্রামে গাঁথা দেশ আমাদের। চলো যাই গ্রামের একটা ডাক ঘরে। চালাঘরের খুঁটিতে সিঁদুরে রঙের ডাকবাক্স ঝুলছে। শীতের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে ডাকঘরের মেটে দাওয়ায়। রানার

ছিদাম ডাক নিয়ে এসেছে। পোস্টমাস্টার চিঠি মিলিয়ে নিচ্ছেন, আর খটাখট্ ছাপ মারছেন চিঠিতে। গ্রামের মোড়লের উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল : 'কৈ হে মাস্টের, চিঠিপত্তর কিছু আছে ?' ছিদাম হয়তো তামাক সেজে ফেলেছে এতক্ষণ। পোস্টমাস্টারের হাত থেকে হুঁকোটা গেল মোড়লের হাতে। তারপর একটানে তামাকটুকু পুড়িয়ে মোড়ল বল্লে : 'দাও দিকি কাগজখানা, কি নিকেচে দিকি।' ইতিমধ্যে আর দু-চারজন গ্রামবাসী এসে পড়েছে। কারো কারো চিঠি এসেছে। পোস্টমাস্টারই পড়ে দিচ্ছেন চিঠি-গুলো। চিঠির জন্যেই যে সবাই আসছে তা ঠিক নয়। গ্রামের



শহরের ডাকঘর

পোস্টঅফিসের দাওয়া অনেকটা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার মত। বেশ আড্ডা জমে ওঠে এখানেও।

চলো যাই নগরজীবনের বড় পোস্টঅফিসে। উঃ কী ভীড় ! একটা পোস্টকার্ড কিনতে গেলেও কিউ-তে দাঁড়াতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। কত কাউণ্টার—মনিঅর্ডার, টেলিগ্রাফ, সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, আরও কত কি ! বিভিন্ন কাউণ্টার দেখেই বোঝা যাচ্ছে কাজ কত

রকমের। একদিকে টেলিগ্রাফের টরেটক্কা, আর এক দিকে টেলি-ফোনের ডায়ালিং। মনিঅর্ডার কাউন্টারের লাইনটা তো ফুটপাথে এসে পৌঁছেচে। আর ফুটপাথে বসে ফর্মলিখে দিচ্ছে বেশ কয়েক-জন লোক, পয়সাও পাচ্ছে মন্দ না।

নাগরিক জীবনের স্নায়ুকেন্দ্র এই ডাকঘর। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে ডাকঘর। সমাজ-জীবনের বহু প্রয়োজনের যোগান দিচ্ছে ডাকঘর।

ঘর আর ঘর
গাঝে ডাকঘর ॥

মানুষ চাঁদের দেশে ঘর বাঁধবে একদিন। সেদিন পৃথিবীর ডাক পৌঁছে যাবে সেখানে।

ফাউণ্টেন পেন

শ্যামচাঁদকে চেনো? ঐ যে দেড় বিঘৎ কলার এঁটে, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে, নতুন জুতোয় মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে, গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচিয়ে যে ছেলেটা স্কুলে আসত আর পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর চেন-ঘড়িটা পকেট থেকে বের করে দেখত? এবারে চিনেছ বোধ হয়। শ্যামচাঁদের সঙ্গে যিনি আমাদের পরিচয় করে দিয়েছিলেন তাঁর কথাতেই বলি ঃ

"শ্যামচাঁদ ক্লাসে আসিয়া পকেট হইতে কালো চোঙার মত কি একটা বাহির করিল, মাস্টারমহাশয় সাদাসিধা মানুষ, তিনি বলিলেন, কি হে খোকা থার্মোমিটার এনেছ যে! জ্বরটর হয় নাকি? শ্যামচাঁদ বলিল, আজ্ঞে না, থার্মোমিটার নয়, ফাউণ্টেনপেন। শুনিয়া সকলের তো চক্ষু স্থির! ফাউণ্টেন পেন? মাস্টার এবং ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন, ব্যাপারখানা কি? শ্যামচাঁদ বলিল, এই একটা ভালকানাইট টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে। একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, ও বুঝেছি, পিচকারী বুঝি? শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া খুব মাতব্বরের মত একটুখানি মুচকি হাসিয়া কলমটিকে খুলিয়া তার সোনালী নিবখানা দেখাইয়া বলিল, ওতে ইরিডিয়ম আছে—সোনার চেয়েও বেশী দামী। তারপর সে যখন একখানা খাতা লইয়া সেই

আশ্চর্য কলম দিয়া তরতর করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর শ্যামচাঁদ কলমটি তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, কি কলমই বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি? শ্যামচাঁদ চট্‌পট্ বলিয়া ফেলিল, 'আমেরিকান স্টাইলো অ্যাণ্ড ফাউন্টেন পেন কোং, ফিলাডেলফিয়া'।"

আমাদের দেশে প্রথম ফাউন্টেন ব্যবহারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সুকুমার রায়ের এই গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। ফাউন্টেন পেন কবে কোথায় কি করে তৈরি হল, এদেশেই বা ঠিক কখন চালু হল জানতে ইচ্ছে করছে, তাই না? কিন্তু ফাউন্টেন পেনের আগে সাধারণ penএর কথাই বলতে হবে। stylo-কলমের নাম তো একটু আগে শুনলে। stylus থেকে styloতে আসতে হাজার হাজার বছর লেগেছে। স্টাইলাস্ কি? স্টাইলাস্ হচ্ছে সবচেয়ে আগেকার লেখবার যন্ত্র বা লেখনী। শক্ত কাঠি, হাড় বা ধাতু দিয়ে তৈরি হত এই স্টাইলাস্। মাথার দিকে মোটা আর মুখের দিকে সরু এই স্টাইলাস্ কাদার ফলকের উপর চাপ দিয়ে লেখা হত। বুঝতেই পারছ কাদাটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাবার আগেই লেখা শেষ করতে হত। উপরে মোমের আস্তর দেওয়া কাঠের ফলকেও স্টাইলাস্ দিয়ে লেখা হত। ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপে এই জাতীয় লেখা পাওয়া গিয়েছে অনেক। প্রাচীন গ্রীস আর রোমেও স্টাইলাসের ব্যবহার ছিল। প্রাচীন ভারতের প্রথম

কলম আঁচড় কেটে বা গভীর রেখাপাত করে লেখবার উপযোগী ছিল। লেখনী নামটাই এর সাক্ষ্য। সংস্কৃতে 'লিখ্' ধাতুর মূল অর্থ আঁচড় কাটা। কালির ব্যবহারটা পরের। হরফগুলোর 'বর্ণ' নামের সঙ্গে হয় তো কালির ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

যে জিনিসটার উপর লেখা হবে সেই জিনিসটাই লেখনীর গতি প্রকৃতি ঠিক করে দেয়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে প্যাপিরাসের উপর লেখা হত নলখাগড়ার কলম দিয়ে। লেখবার দিকটা ছুরি দিয়ে চোখা করে নিয়ে মুখটা একটু চিরে নেওয়া হত। মিশরের বিশেষ এক ধরণের নলখাগড়ায় খুব ভাল কলম তৈরি হত। একে বলা হত কালামুস্ (calamus)। 'কলম' শব্দটির উৎস এই নামে। নলখাগড়ার কলম ইউরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত চলেছে। মিশর, পারস্য এবং ভারতে এখনও এর অল্পবিস্তর চল আছে। পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বাঁশের কঞ্চির কলমও চলে।

নলখাগড়ার কলমের পরে বলতে পালকের কলমের কথা। হাঁস, চিল, ময়ূর ইত্যাদি পাখির পালকের গোড়ার দিকটা বেড়ে নিয়ে কলমের কাজ করা হত। pen কথাটা এসেছে ল্যাটিন penna থেকে। penna মানে পালক ঠিক কখন



পালকের কলম

থেকে পালকের কলম চালু হয় বলা শক্ত, তবে ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি কোন সময় থেকে হতে পারে। পালকের কলম কিছু দিন আগেও সারা ইউরোপে চলত।

পালকের কলম বারবার কালিতে ডুবিয়ে লিখবার ফলে ক্ষয়ে যেত তাড়াতাড়ি। বারবার বেড়ে নেওয়াও এক ঝামেলা। আরও শক্ত লেখনীর কথা মানুষ ভাবতে লাগল, ফলে এলো ষ্টীল পেন, কিন্তু এও প্রথমে ঐ খাগের কলম বা পালকের অনুকরণেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নমনীয়তার অভাবে ভাল লেখা যেত না এই কলমে, অনেক সময় কাগজই যেত ছিঁড়ে।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে জোশেফ ব্রামা হাঁসের পালককে ছোট ছোট টুকরো করে কাটবার জন্যে একটা যন্ত্র বানালেন। আর এই টুকরোগুলো থেকেই তিনি তৈরি করলেন নিব্। এই নিব্ আলাদা হোল্ডারে জুড়ে দিয়ে তিনি নতুন ধরণের কলম বানালেন। এতদিন পরে কলম 'নিব্' আর 'হোল্ডার' এই দুই অংশে বিভক্ত হল। নিব্গুলো পালকের হওয়াতে এতে বেশ নমনীয়তাও থাকল। লেখকদেরও ইচ্ছে মত সরু মোটা হোল্ডার ব্যবহার করার সুযোগ হল। কিন্তু পালকের নিব্ তো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবার কথা। এ সমস্যারও সমাধান হল। শিগ্গিরই ধাতু থেকে এমন নিব্ তৈরি হল যা অনেকটা পালকের নিবের



হোল্ডার কলম

মতই নমনীয়, অথচ টেকসই। ১৮৩০ সালে বার্মিংহামে ব্যাপক ভাবে স্টীল নিব আর হোল্ডার তৈরি শুরু হল।

যে-কোন আবিষ্কারের পিছনে প্রয়োজনের একটা তাগিদ থাকে। ফাউন্টেন পেন আবিষ্কারের বেলাতেও তাই। আমাদের চিন্তা বা ভাবনা কথার রূপ ধরেই আসে আর তাকেই আমরা লেখায় ধরে রাখি। ভাবা আর লিখে ফেলার মধ্যে ব্যবধানটা যত কমে ততই সুবিধা। লিখতে গিয়ে বারবার হাতটা চলে যাচ্ছে দোয়াতের দিকে, সেই সঙ্গে মনটাও। কোনবার হয় তো কালিই উঠল না কলমে, কোনবার হয় তো উঠল কিছু বেশিই, একটু ঝেড়ে নিতে হল কলমটা। এতে চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে না গেলেও তাতে টান পড়ে জোর। এমন কলম চাই যা একবার কাগজে একবার দোয়াতে ছুটোছুটি না করে শুধু কাগজেই একাগ্র হতে পারে। প্রবাদে আছে, কালি কলম মন লেখে তিন জন। তিন জন নয়, দুই জন চাই—কালি কলম মিলে একজন, আর মন আর-এক জন: দুজনে মুখোমুখি।

আরো জোর তাগিদ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যস্ততা আর ছুটোছুটিও বাড়তে থাকল, কখন কোথায় লিখতে হবে ঠিক নেই, কলম আর দোয়াত নিত্য সঙ্গে বয়ে বেড়াবে কে? এমন একটা লেখনী চাই যা কালি আর কলমকে মিশিয়ে তৈরি যেখানে খুশি সঙ্গে নেওয়া যায়। চেষ্টা চলতে থাকল। নলখাগড়া বা পালকের ফাঁপা অংশটিই মানুষকে দিল ফাউন্টেন পেনের ইঙ্গিত। ফাঁপা যখন, তখন নিশ্চয় তাতে কিছু ভরা

যায়। কি ভরা যায়? কালি। কারণ, কলম সম্পর্কে কালির কথাই তো সব চেয়ে আগে মনে হবে। বারবার দোয়াতে চুবোতে গিয়ে দোয়াতটা হয়তো কাৎ হয়ে গেল, ফলে একটু



ফাউণ্টেন পেন

কালি ঢুকে গেল ফাঁপা নলটায়। লিখতে যেতেই কিছুটা কালি বেরিয়ে এসে কাগজে পড়ল। লেখকের মনে হল, বাঃ বেশ তো, দোয়াতটা আলাদা না থেকে এই ফাঁকা অংশটা বা নলটাই যদি দোয়াতের কাজ করে অর্থাৎ এই নলের মধ্যে কালি ভরে কালির প্রবাহটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবেই তো দিব্যি লেখা যেতে পারে, দোয়াতে আর কলম চুবোতে হয় না। লেখনী নিজেই হয়ে যায় মস্যাধার বা মসীর আধার। এই ভাবেই মানুষ কালি আর কলমের বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করেছে।

ফাউণ্টেন পেন প্রথমে কে বানিয়েছিলেন বলা যায় না, তবে ফাউণ্টেন পেন বানাবার চেষ্টা হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে। ছাপার হরফে ফাউণ্টেন পেন শব্দটি প্রথমে দেখা যায় ১৭১০ সালে। তবে তখনকার ফাউণ্টেন পেন কি দিয়ে কেমন করে বানানো হয়েছিল নিশ্চয় করে বলা মুশকিল।

১৮০৯ সালে জোশেফ ব্রামা পালকের ফাউণ্টেন পেন বানালেন। নিবের কাছের ফাঁপা মুখটায় সূক্ষ্ম ছিদ্র করা একটা কর্ক এঁটে দিয়ে। প্রথম প্রথম আঙুল দিয়ে ধরবার জায়গাটা একটু পাতলা

করে চেঁছে দেওয়া হত আঙুলের চাপে যাতে কালি ঝরবার সুবিধা হয়। কিন্তু তাতে কখনও কখনও কালি ঝরত অঝোর ধারে লেখাকে দিত ভাসিয়ে। কালিটাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা হতে থাকল ক্রমশঃ। কালি যাতে নিবের কোন ক্ষতি না করতে পারে, আর নিবটা যাতে টেকসই হয় তার জন্যে সোনা এবং সোনা দিয়ে গিল্টি করা নিব্ চালু হয়। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার হকিন্স্ প্রথম ইরিডিয়ম দেওয়া নিব্ তৈরি করেন। এই ইরিডিয়মের কথাই শ্যামচাঁদ বলছিল তার আশ্চর্য কলমের বর্ণনায়। নিব্টাকে অক্ষত রাখবার জন্যে অনেক রকমের চেষ্টা হয়েছে, নিব্টাকে নলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে নানা ধরণের ফাউণ্টেন পেন করা হয়েছে। কিন্তু ক্যাপের ব্যবহার হতে দীর্ঘ দিন লেগেছিল। ক্যাপ দিলে যে নিব্টাও বাঁচবে আর কলমের ব্যবহার যোগ্যতাও বাড়বে এ বিষয়টি কি করে নির্মাতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ভাবতে অবাক লাগে। তবে অনেক সময়ে 'নিজের দুটি চরণ ঢাকো তবে ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে' এই সহজ কথাটাও আমরা ভুলে যাই, তাই না?

আচ্ছা, ফাউণ্টেন পেন উপুড় করা মাত্র কালি ঝরে পড়ে না কেন? এর মূলে আছে বায়ুর চাপ। বাহিরে এই বায়ুর চাপ স্বাভাবিক থেকে খুব কম হয়ে গেলে মানুষের রক্তও চুঁইয়ে পড়ে যেত শরীরের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে। ফাউণ্টেন পেনের বেলাতেও তাই। যে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে কালি আসে বাহির থেকে বায়ুর চাপের ফলে তা ঝপ করে ঝরে পড়ে না। কিন্তু লেখা শুরু

করতেই কালি আসে কেন? এর কারণ নিব্‌টায় চাপ দিতেই নিব্‌ থেকে কালি কাগজে চলে যায় বলেই ক্রমাগত ভিতরের কালিকে টেনে নিবে নিয়ে আসে। একটা উদাহরণ দিই। আঠার শিশির মুখে রবারের একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করা ছিপি থাকে। শিশিটা ওল্টালেও আঠা বাইরে পড়ে যাবে না, কিন্তু কাগজের ওপর চাপ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে একটু আঠা বেরিয়ে আসবে, তারপর যতই কাগজের ওপর ছিপিটাকে টানবে ক্রমাগত ততই আঠা বেরিয়ে এসে কাগজে লাগবে। বিজ্ঞানে এই ব্যাপারটাকে বলে ক্যাপি-লারি অ্যাকশন। ফাউণ্টেন পেন দিয়ে ক্রমাগত লিখে চলাও সম্ভব হয় এই প্রক্রিয়ায়।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারে ফাউণ্টেন পেনের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি এর নির্মাণ কৌশলে। ব্যাপক ভাবে ভাল জাতের ফাউণ্টেন পেন তৈরি শুরু হয় ১৮৭৮ সাল থেকে। ইংলণ্ড আর আমেরিকাই ছিল এবিষয়ে অগ্রণী। আমাদের দেশে ফাউণ্টেন পেন আসে উনিশ শতকের শেষের দিকে। দুচার জন ভাগ্যবানের হাতেই তখন 'স্টাইলো' বা 'সোয়ান' শোভা পেত। এখন তো কত রকমের কত ভাল ভাল ফাউণ্টেন পেন, কত রকমের নিব্‌, কালি ভরবার কায়দাই বা কত রকম। আজ ফাউণ্টেন পেন তোমাদের পকেটে পকেটে। কিন্তু ৫০।৬০ বছর আগে ছেলেরা নিজেরা ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করার কথা কল্পনাই করতে পারত না। বড়দের কেউ ফাউণ্টেন পেন দিয়ে লিখলে তারা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকত। বলা

বাহুল্য লিখতে ইচ্ছে হত খুব। কিন্তু মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখতে হত।

বিখ্যাত ব্যারিস্টারের ফাউন্টেন পেন হারাল টেবিল থেকে। কোথায় গেল, কে নিল? 'মুন্না, মুন্না!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। অবশেষে আসামী ধরা পড়ল। সাত আট বছরের ব্যারিস্টার-পুত্র কলমটি নিয়ে পালিয়েছিল। লিখতে যাবে এমন সময় হাতে নাতে ধরা পড়ল বেচারা। এই ব্যারিস্টার হলেন মতিলাল নেহরু আর আসামী মুন্না হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু।

জুতা

হবুচন্দ্র রাজা রেগেই অস্থির ঃ

মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাঝে চরণ ফেলামাত্র।

অতএব গবুচন্দ্র মন্ত্রীর চোখেও ঘুম নেই। রাজার পায়ে যাতে ধুলো না লাগে তার একটা উপায় করতেই হবে, নইলে কারো রক্ষে নেই। প্রথমে সাড়েসতেরো লক্ষ ঝাঁটা দিয়ে ধুলো দূর করার চেষ্টা হল, কিন্তু হিতে বিপরীত—ধুলোর ধূমধাড়াক্কা! শেষে একুশ লাখ ভিস্তি দিয়ে ধুলোর হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা। রাজা রেগে টং ঃ

এমনি সব গাধা
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।

এর পর কেউ বল্ল মাছুর বা ফরাস দিয়ে পৃথিবী ঢাকতে, কেউ বল্ল রাজাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হোক, ধুলোয় পা না দিলে তো আর ধুলো লাগতে পারে না। কেউ বল্ল, চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী। কিন্তু অত চামড়াই বা কোথায়, আর তেমন চামারই বা কোথায়।

শেষে বুদ্ধি দিল চামার কুলপতি ঃ

নিজের ছুটি চরণ ঢাকো তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।

রাজার পদ চর্ম আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে
মন্ত্রী কহে আমারো ছিল মনে
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।

জুতা আবিষ্কারের এ কাহিনী তো তোমাদের সকলেরই জানা। পৌরাণিক কাহিনী আছে মহাভারতে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পাদুকা আর ছত্র-দান পুণ্যকর্ম বলে গৃহীত হল কেন। এই প্রশ্নের জবাবেই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন জমদগ্নি মুনির শরক্রীড়ার কাহিনী—সেই বাণ কুড়োতে গিয়ে রেণুকার বিলম্ব, আর বিলম্ব দেখে জমদগ্নির ক্রোধ এবং সূর্যকে আসল অপরাধী জেনে তাকে বাণবিদ্ধ করবার সংকল্প। তারপর জমদগ্নির ক্রোধানল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সূর্যের ব্রাহ্মণ বেশে আগমন এবং জমদগ্নিকে *ছত্র ও পাদুকা দান।

এত গেল কাল্পনিক এবং পৌরাণিক কাহিনী।

এবারে এসো আমরা একটু সন্ধানী মন নিয়ে জুতো আবিষ্কারের গোড়ার কথাটা জেনে ফেলবার চেষ্টা করি। অবশ্য কাল্পনিক ও পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করেই অনেক গবেষণায় সাফল্য এসেছে।

মানুষের জীবনধারণের জন্যে সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে খাদ্য আর বাসস্থান। আদিম মানুষকে এদুটোর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কঠিন পথে চলতে চলতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পা। খুব স্বাভাবিক কারণেই চলবার সময় পা-দুটোকে কোন

* এই প্রসঙ্গে ছাতার কথার সম্পূর্ণ গল্পটি পড়ে নাও।

আবরণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেছে তারা। আর এই আবরণের কল্পনা থেকেই জুতো আবিষ্কার।

ঠিক কতদিন আগে মানুষ জুতো পরতে শুরু করে নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে সম্ভবতঃ নতুন পাথরের যুগে মানুষ চামড়ার জুতো ব্যবহার করেছে। মাটির নিচ থেকে হাড়ের ছুঁচ আর এমন ধরণের পাথুরে যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে যা দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন।

মানুষের প্রথম জুতো খুবই সহজ-গড়নের হবে বলাই বাহুল্য। স্যাণ্ডেলই হচ্ছে মানুষের প্রথম পাদুকা—এক ফালি পুরু চামড়া, চামড়ার ফিতে বা শক্ত লতা দিয়ে কোন রকমে পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা। পৃথিবীর সব জায়গাতেই প্রথমে মানুষ স্যাণ্ডেল ব্যবহার করেছে। আজকের সভ্য দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ স্যাণ্ডেল ব্যবহার করে।

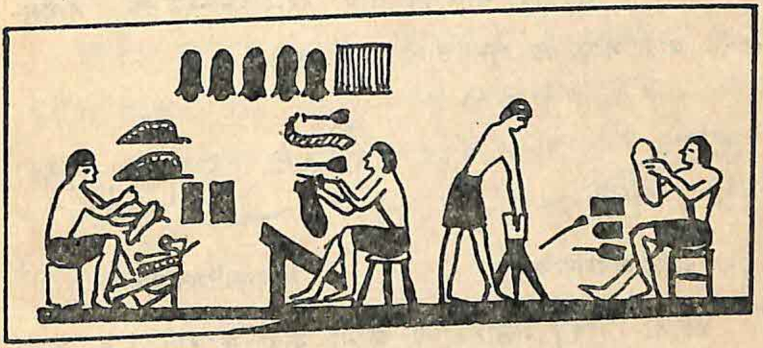


প্রাচীন গ্রীক স্যাণ্ডেল

কিন্তু খুব ঠাণ্ডা যেখানে সেখানে স্যাণ্ডেলে তো আর চলে না। তাই প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন ধরণের জুতোর কথা মানুষ ভাবতে লাগল। শীতের দেশের মানুষ গোটা পা-টাই ঢাকবার চেষ্টা করল। রেড-ইণ্ডিয়ানদের গোড়ালি পর্যন্ত গোটা পায়ের পাতা ঢাকবার প্রথম জুতোর নাম মোকাসিন। এ নামে আধুনিক কালের বিশেষ ধরণের জুতো আছে তা তো জানোই। আদি-মোকাসিনের জন্ম কি করে হল তা নিশ্চয় করে বলা যায়

না। একটু কল্পনার আশ্রয় নিতেই হয়। প্রাচীন মানুষ নরম চামড়ার একরকম থলি ব্যবহার করত। থলির চুনোট করা মুখের দিকটায় থাকত দড়ি-পরানো। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে হয়তো ঐ থলিই পায়ে পরল। মুখের দিকটার দড়িটা গোড়ালির সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে। ঐ থলি-জুতোরই উন্নত সংস্করণ আধুনিক 'শু', অনেকে এরকম অনুমান করেছেন।

থীব্সের কবরের দেওয়ালে জুতো তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো —একেবারে চামড়ার সংস্কার করা থেকে শুরু করে স্যাণ্ডেল বা জুতোর রূপায়ণ পর্যন্ত চিত্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মিশরের

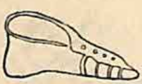


প্রাচীন মিশরের চর্মকার

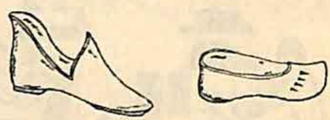
চর্মকারেরা জুতো তৈরির কাজে যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত তার সঙ্গে এখনকার যন্ত্রপাতির মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। মিশরবাসীরা ভালো ভালো জুতো তৈরির ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল। চর্মকারদের বেশ সম্মানও ছিল সমাজে। তারা বিভিন্ন রুচির জুতো তৈরির কাজে বেশ পটু ছিল।

সমাজে নারী এবং পুরুষ পদমর্যাদা ভেদে বিভিন্ন রকমের জুতো ব্যবহার করত। গ্রীক ও রোমের অভিনেতারা নাটকের বিষয়বস্তু অনুযায়ী একেক রকমের জুতো পরত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটু বেশি যোগাযোগ ছিল বলে রোমের পাদুকা-শিল্পে অন্যান্য দেশের প্রভাব পড়েছে বেশি। রোমান বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতারা বাস্কিন (buskin) নামে এক ধরণের উঁচু হিলের জুতো পরত। বাসকিনই বোধ হয় উঁচু-হিলের প্রথম নমুনা। অবশ্য উত্তুরে দেশগুলোতেও ভারি 'সোলের' বুটজুতো একদিক থেকে হাই-হিল জুতোর সমধর্মী।

আধুনিক জুতোর আদিপর্ব পাই মধ্যযুগে—ধর্মযুদ্ধ, সামন্ত-প্রথা আর সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের সময়ে।



মধ্যযুগের প্রথমদিকের

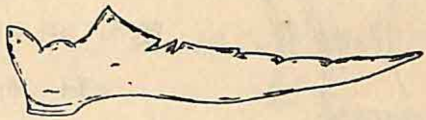


রেনেসাঁসের যুগের

ফরাসী দেশের সভাসদ্‌দের জন্যে যারা জুতো তৈরি করত খুব খাতির ছিল তাদের। ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতা সব এসে ভর করল যেন জুতোর ওপর। বহু চটকদার জুতো তৈরি হয়েছে ফরাসী দেশে।

এতদিন কিন্তু পায়ের গঠন বা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে জুতো তৈরি হয় নি। সে দিকে লক্ষ্য রেখে জুতো তৈরি শুরু হয় উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ইংলণ্ডে ১৭৮৫ সালে ডান-পা আর

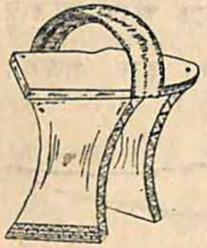
বাঁ-পায়ের বিশেষ গড়ন অনুযায়ী জুতো তৈরি আরম্ভ হয়। এর আগে সাধারণ জুতো বা বুটজুতোর একটি জোড়ার যে কোন একটি ডান-পায়ে বা বাঁ-পায়ে পরা যেত। পরতে পরতে অবশ্য জুতোর চেহারা কিছুটা ডান-পা-ঘেঁষা বা বাঁ-পা-ঘেঁষা হয়ে পড়ত। জুতোকে মজবুত করার নানা চেষ্টা হয়েছে কিন্তু পায়ের গড়ন অনুযায়ী এক জোড়ার দুইটিকে দুরকম করে গড়বার ব্যাপারটা বিবেচনার মধ্যেই আসে নি।



পীক্‌ড শু
ইউরোপীয় ॥ ১৫ শতক
যিনি পরতেন তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী
জুতোর শুঁড় ছোটবড় হত।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া হল জুতো তৈরির কাজে। এর আগে হাতেই তৈরি হত জুতো। উন্নত-ধরনের যন্ত্রের সাহায্য নেবার ফলে জুতো তৈরির পদ্ধতি বা আদর্শের মধ্যে কিছুটা সমতা এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক জায়গায় জাতিগত সংস্কারের ফলে তেমন পরিবর্তন আসে নি। চীনের মজুরেরা এখনও নলখাগড়ার বুনটের এক বিশেষ ধরণের স্যাণ্ডেল পরে। আর ব্যবসায়ী বা অভিজাত শ্রেণীরা, ঢিলে ঢালা পুরু সোলের একধরনের চটি ব্যবহার করে। চীনের মেয়েদের তো ছোট্ট জুতো পরিয়ে পায়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে পর্যন্ত চেপে রাখা হয়েছে কিছুদিন আগে পর্যন্তও। অবশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একেকধরণের জুতো খাপ খেয়ে গেলে তাকে সহজে বদলানোও কঠিন।

জুতো তৈরির উপাদান প্রধানতঃ চামড়া। কিন্তু এখনও অনেক দেশে যেমন বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে কাঠের জুতোর ব্যবহার আছে। সেখানকার কোন কোন অঞ্চলে এক বিশেষ ধরণের ঘাসের (esperto) জুতোর চল আছে।



টার্কিশ উডেন চোপাইন
উচ্চতা ৮´´

এখন তো মেশিনে তৈরি নানা রকমের জুতো প্রচুর তৈরি হচ্ছে। লিনেন, নাইলন, রবার প্ল্যাষ্টিক কত কি-ই না ব্যবহার হচ্ছে জুতো তৈরির কাজে। যারা কখনও জুতো পরত না, তাদের অনেকেই এখন জুতো পরছে।



ইতালীয়, ১৬ শতক

ভারতবর্ষে কাষ্ঠপাদুকা, ওরফে খড়ম এবং চামড়ার চটি বা জুতো অনেক দিন থেকেই চলছে। তবে মেয়েরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত চটি, স্যাণ্ডেল বা জুতো কিছুই পরত না। এখনও আমাদের মাসিমা-পিসিমাদের অনেকেই জুতো পায়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন।



চোপাইন (হাই-শু)
ভিনিসীয় ॥ ১৬ শতক
উচ্চতা ৮½ ইঞ্চি

শহুরে সভ্যতা গড়ে ওঠার আগে পল্লী-প্রধান বাংলা দেশে জুতো খুব কমই ব্যবহার হত। খড়মটাই চলত বেশি, জুতোটা ছিল আনুষ্ঠানিক। পঞ্চদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পাদুকা বোঝাতে 'বাধা' এবং 'পানই' বা বাধা-পানই ব্যবহার হয়েছে।



ডাচ, ১৭ শতক

'মোজা পানই আর জিন,   নিরময়ে অনুদিন.

চামার বসিল এক ভিতে।' (কবিকংকণ)

এখানে 'পানই' সম্ভবতঃ চামড়ার জুতোই বোঝাচ্ছে। 'পানই' শব্দ এসেছে সংস্কৃত উপানহ্ থেকে।

গানে আছে, 'নৈলে কেন নন্দের বাধা বহি আমি মস্তকে।' এখানে 'বাধা' মানে সম্ভবতঃ খড়ম।

প্রাচীন গ্রাম্য ছড়ায় খোকনবাবুর পরনেও দেখি জুতো, তবে হাজার হল খোকনবাবুর তো, তাই জুতো সেখানে হয়ে গেছে জুতুয়া ঃ

খোকা এলো বেড়িয়ে
দুধ নাও গো জুড়িয়ে ॥
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন খ্যাপ্ত ॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুন্দর মন্তব্যটি শোন ঃ

'আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোটো ঘুন্টি দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া সেটা হইল জুতুয়া। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।'

বাহারে জুতো পরবার রেওয়াজ আমাদের দেশের জমিদারদের মধ্যে ছিল। জমিদার বা রাজামহারাজাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে কে কত ভাল পোশাক পরে আসতে পারে তা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা পড়ে যেত। অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া থেকে একটা গল্প বলি শোন ঃ

শ'বাজারের রাজবাড়িতে জলসা হবে—বিরাট আয়োজন। শহরের অর্ধেক লোক জমা হবে সেখানে যত বড়ো বড়ো লোক রাজারাজড়া সকলের নেমন্তন্ন হয়েছে। তখন কর্ত্তাদাদামশায়দের (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বিষয় সম্পত্তির অবস্থা খারাপ। ওই যে-সময়ে উনি পিতৃঋণের জন্য সব কিছু ছেড়ে দেন, তার কিছুকাল পরের কথা। শহরময় গুজব রটল বড়ো বড়ো লোকেরা বলতে লাগলেন—দেখা যাক এবারে উনি কি সাজে আসেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। বাড়ির কর্ম্মচারীরাও ভাবছে, তাই তো। গুজবটি বোধ হয় কর্ত্তাদাদামহাশয়ের কানেও এসেছিল। তিনি করমচাঁদ জহুরীকে বৈঠকখানায় ডাকিয়ে আনালেন বিশ্বেস দেওয়ানকে দিয়ে। করম-চাঁদ জহুরী সেকালের খুব পুরানো জহুরী—এ বাড়ীর পছন্দ মাফিক সব অলংকারাদি করে দিত বরাবর। কর্ত্তাদাদামশায় তাকে বললেন, এক জোড়া মখমলের জুতোয় মুক্তো দিয়ে কাজ করে আনতে। তখনকার দিনে মখমলের জুতো তৈরি করিয়ে আনতে হত। করমচাঁদ জহুরী তো এক জোড়া মখমলের জুতো ছোট ছোট দানা দানা মুক্তো দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তৈরি করে এনে দিলে। এখন জামা কাপড়—কী রকম সাজ হবে। সরকার

দেওয়ান সবাই ভাবছে শাল-দোশালা বের করবে, না সিল্কের জোব্বা, না কী! কর্ত্তাদাদামশায় হুকুম দিলেন ও-সব কিছু নয়, আমি সাদা কাপড়ে যাব। তখনকার দিনে কাটা কাপড়ে মজলিসে যেতে হত, ধুতি চাদরে চলত না। জলসার দিন কর্ত্তাদাদামশায় সাদা আচকান জোড়া পরলেন, মায় মাথার মোরাসা পাগড়িটি অবধি সাদা—কোথাও জরি-কিংখাবের নাম গন্ধ নেই। আগাগোড়া ধব্‌ধব্‌ করছে বেশ; পায়ে কেবল সেই মুক্তো-বসানো মখমলের জুতো জোড়াটি। সভাস্থলে সবাই জরিজরা কিংখাবের রংচঙে পোশাক পরে, হীরেমোতি যে যতখানি পারে ধনরত্ন গলায় ঝুলিয়ে আসর জমিয়ে বসে আছেন—মনে মনে ভাবখানা ছিল, দেখা যাবে দ্বারকানাথের ছেলে কি সাজে আসেন। সভাস্থল গম্‌গম্‌ করছে—এমন সময়ে কর্ত্তাদাদামশায়ের সেখানে প্রবেশ। সভাস্থল নিস্তব্ধ—কর্ত্তাদাদামশায় বসলেন একটা কৌচে পা-দুখানি একটু বের করে দিয়ে। কারও মুখে কথাটি নেই। শ'বাজারের রাজা ছিলেন কর্ত্তাদাদামশায়ের বন্ধু, তাঁর মনেও একটু যে ভয় ছিল না তা নয়। তিনি তখন সভার ছেলে-ছোকরাদের কর্ত্তাদাদামশায়ের পায়ের দিকে ইশারা করে বললেন—'দেখ্‌ তোরা দেখ্‌, একবার চেয়ে দেখ এদিকে, একেই বলে বড়োলোক! আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি—ইনি তা পায়ে রেখেছেন।'

জুতোর গল্প এইখানেই শেষ করছি।

কাপড়

দুই দিকে পার, দুই পার ঘেঁষে বয়ে চলেছে নদী। নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে কত কি!

ভাবছ নদীর পারে বসে কাব্যি করছি। মোটেই নয়, একটা বহু পুরোনো শাড়ির বর্ণনা দিতে চেষ্টা করছি মাত্র। শাড়ির দুদিকের পাড় যেন নদীর দুই তীর। মাঝখানে চিত্রিত হয়েছে নদীর ঢেউ আর তার মধ্যে সমাজ সংসারের নানান্ চিত্র। যেন জীবন-নদী বয়ে চলেছে।

এ হল এককালে বহুল প্রচলিত বালুচর* শাড়ি। প্রাচীন বাংলায় মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, লক্ষ্মীবিলাস, দ্বারবাসিনী, সিলহটী, গাঙ্গেরি ইত্যাদি কত কাপড়ই না ছিল! ঢাকাই মস্‌লিনের কথা কে না জানত?

আমরা আজ নতুন নতুন কাপড় তৈরি করছি। নতুন রুচি, নতুন আবিষ্কার। পরিচ্ছদ আজ সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখন যা হচ্ছে তা তো দেখছি, তা তো বুঝছি। কিন্তু নাইলন রেয়নের যুগ তো আর হঠাৎ আসেনি। হাজার হাজার বছর লেগেছে কাপড় বোনার ইতিহাসের এই পর্যায়ে আসতে।

মানুষের সভ্যতার যখন হাঁটি-হাঁটি-পা, তখন মানুষ কি পরত

* অধুনা প্রচলিত বালুচর শাড়ির সঙ্গে আলোচ্য শাড়ির কোন মিল নেই।

কেমন করে পরত, কবে তারা প্রথম কাপড় বুনল কি দিয়ে বুনল এসব প্রশ্নের জবাব চট্ করে দেওয়া মুশকিল।

আদিম মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকেই প্রথম শিক্ষা পেয়েছে। পাখিকে তারা বাসা বুনতে দেখেছে, নিজেরা লতাপাতা দিয়ে নিজেদের বাসা বুনবার চেষ্টা করেছে। বাসা অর্থাৎ কোন আবরণের মধ্যে থাকবার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ থেকে গায়েও আবরণ দেবার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমে তারা পরল পাতার আবরণ। পাতাগুলোকে কাঁটা দিয়ে গেঁথে তারা পরল। এ হল মানুষের প্রথম পরিচ্ছদ।



ডেনমার্কে পাওয়া
প্রাচীন মানুষের পরিচ্ছদ
(আদি লৌহযুগ)

তারপর মানুষ লোমসুদ্ধ পশুর চামড়া পরেছে। বড় পশুর চামড়া শক্ত, ব্যবহার করা কঠিন, তাই ক্রমশঃ খরগোশজাতীয় ছোট পশুর চামড়া একসঙ্গে জুড়ে নিয়েছে। জুড়ল কি দিয়ে। সূঁচ দিয়ে। হাড় থেকে তৈরি সূঁচ। সূঁচ তো হল, কিন্তু সুতো? না হলে সেলাই হবে কি দিয়ে? সুতোর কাজ করেছে লতা বা পশুদের স্নায়ু—ধনুকের ছিলা বানাতেও যা কাজে লাগত। তাহলে

দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে সরাসরি পাওয়া সুতোর ব্যবহার তারা করেছে—এই সুতো হল উদ্ভিদের লতা এবং পশুদের স্নায়ু। কিন্তু সুতো তৈরি করতে মানুষের আরও সময় লাগল।

সুতো তৈরির উপাদান আছে উদ্ভিদে আর পশুতে। কার্পাস, শণ, পশুলোম আর গুটিপোকার লালা—এই হচ্ছে সুতো তৈরির প্রধান উপকরণ। এই চারটি উপাদানের কথা বলি এবার।

তুলোর চাষ প্রথমে হয় ভারতবর্ষে, মিশর সম্ভবতঃ ভারত থেকেই তুলো আমদানি করেছিল। মমিদের গায়ে জড়ানো তুলোর কাপড় থেকে বোঝা যায় অন্ততঃ ৫০০০ বছর আগে মিশরবাসী তুলোর কাপড় বুনেছে। ভারতে এর কিছু আগেই তুলোর কাপড় বোনা হয়েছে।

নতুন পাথরের যুগে শণের চাষ হয়েছে। ফ্যারোয়াদের মিশরে শণের চাষ এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে মুসার ten plagues এর মধ্যে একটি ছিল 'শণের বিনাশ'। শণ থেকে খুব শক্ত সুতো তৈরি হত। নৌকোর পাল তৈরি হত শণের সুতো থেকে। বাংলাদেশের পাট এই শণের আত্মীয়। আমাদের দেশে বৈদিক যুগ থেকে শণের চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু পাট অনেক পরের। দশম শতকের আগে পাট চাষ হয় নি আমাদের দেশে।

এশিয়ার যাযাবরদের পরিচ্ছদের জন্যে পশম ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শণ বা কার্পাসের আগে মানুষ পশমী কাপড় বানিয়েছে।

রেশম প্রথমে চীনারাই তৈরি করে। ইউরোপে রেশমের চল হয় ষষ্ঠ-শতকে। রেশম আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। চার

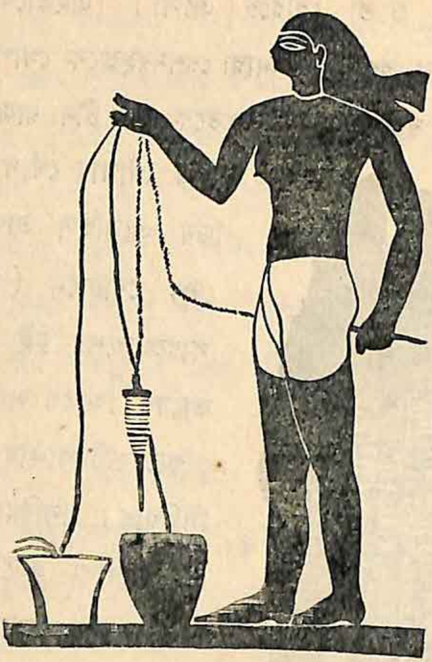
হাজার বছর আগে মহারাজ হুয়াংতির রানী সি-লিংশী প্রাসাদ উদ্যানে বেড়াচ্ছিলেন। তুঁতগাছের শাখায় অনেকগুলো রুপোলি বল ঝুলছিল। রানী একটাকে পরীক্ষা করলেন। রানীর হাত পড়তেই একটা চক্‌চকে সুতো বেরিয়ে এলো। এইভাবেই সি-লিংশী আবিষ্কার করলেন রেশম। চীনারা রেশমরহস্যকে গোপন রেখেছিল অনেক দিন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এক চীনা রাজকুমারী নাকি তার খোঁপায় গেঁথে গুটিপোকার ডিম এনেছিল তার শ্বশুরবাড়ির দেশ খোটানে (তুর্কিস্থানে)। পারস্যদেশের দুই সাধুও নাকি তাদের বেতের লাঠির ফোকলে ঢুকিয়ে গুটিপোকার ডিম এনেছিল সিরিয়ায়। সিরিয়া থেকে গ্রীস, গ্রীস থেকে ইউরোপের নানা দেশে ক্রমশঃ রেশমের চল হল। আমাদের দেশে কেউ দাড়ি বা খোঁপায় করে গুটিপোকার ডিম এনেছিল কিনা জানা নেই। তবে রেশমের ব্যবহার আমাদের দেশে শুরু হয়েছে মৌর্যযুগ থেকে।



ডেনমার্কে পাওয়া
প্রাচীন মানুষের একটি পরিচ্ছদ
(ব্রোঞ্জযুগ)

উপাদানের কথা তো বল্লাম। এবার বলি সুতো কাটবার কথা। সুতো কাটা হত তকলি বা টেকোতো। নতুন পাথরের যুগের

অসংখ্য তকলি আবিষ্কৃত হয়েছে। চাকতিটা সে যুগের মানুষ পাথর বা মাটি দিয়ে বানাত, আর কাঠিটা অনেক সময় হত হাড়ের। মানুষের সুতো কাটার আদিম যন্ত্র হচ্ছে তকলি। তকলির উন্নত



তক্‌লি বুনছে প্রাচীন মিশরের মেয়ে

সংস্করণ চরকা আবিষ্কার হয় আমাদের দেশেই ৫০০ থেকে ১০০০ শতকে। তা হলে বুঝছ হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তকলিতেই সুতো কেটে এসেছে। আমরা তৈরি করলাম হাতে-চালানো চরকা, চীন পরে তৈরি করল পায়ে-চালানো চরকা। আরবরা আমাদের কাছ থেকে শিখে ইউরোপকে শেখাল চরকা চালাতে।

সুতো তৈরির কথা তো হল, এবারে শোন সুতো থেকে কাপড়

বুনবার কথা। কাপড় তৈরির আগে মানুষ বেড়া বুনেছে, মাদুর বুনেছে। বেড়া বা মাদুর বোনার সঙ্গে কাপড় বোনার মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। তবে খড় বা নলখাগড়া মাটিতে সার করে রেখে গাঁথা যায়। কিন্তু সরু সুতো ঘনসংলগ্ন করে মাটিতে রেখে কাপড় বোনা মুশকিল, একটার সঙ্গে আর একটার জড়িয়ে যাবার ভয়। প্রথমে তারা সেই চেষ্টাই হয়তো করেছে, তারপর অসুবিধা বোধে তাদের মত করে তাঁত বানাবার চেষ্টা করেছে। প্রথমে তারা দুটো কাঠি প্রয়োজনীয় ব্যবধানে মাটিতে পুঁতেছে। কাঠির মাথা



তাঁতে কাপড় বুনছে প্রাচীন মিশরের মেয়ে

তোমাদের গুল্‌তির মত। তার ওপরে আর একটা কাঠি রেখে তার সঙ্গে সুতো ঝুলিয়ে দিয়েছে, এবং সেগুলো যাতে একটা আর একটার সঙ্গে জড়িয়ে না যায় তার জন্যে প্রত্যেক সুতোর নিচে

পাথরের টুকরো বেঁধে দিয়েছে। একেই বলে 'টানা' সুতো (warp)। এর মধ্যে দিয়ে 'পড়েন' সুতো (woof) গেঁথে দেওয়া হত সমকোণে। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর অনেকখানেই মাটির নিচ থেকে এরকমের তাঁতের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ক্রমশঃ তাঁতকে মাটির সঙ্গে সমান্তরালে রেখে কাপড় বুনবার চেষ্টা হয়। এতে 'টানা' সুতোয় টান রাখবার জন্যে একদিককার কাঠি আবার একজনের মাজায় বেঁধে রাখা হত। সুতোয় টান দিতে হলে তো শরীরটা পিছন দিকে হেলত, ঢিল দিতে হলে সামনের দিকে ঝুঁকত। পেরুর তাঁতিরা এরকমের তাঁত যথেষ্ট ব্যবহার করেছে। ক্রমশঃ চারদিকে কাঠ দেওয়া ফ্রেম তৈরি হয়। তখন তাঁতের কাজ আরও সহজে এবং সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়। 'পড়েনের' সুতোকে টানাসুতোর একটার উপর দিয়ে আর একটার নিচ দিয়ে চালিয়ে দিতে প্রথমে আঙুলের ব্যবহার হত। মাকু চালু হয় অনেক পরে।

মাটির নিচে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে এমন সবচেয়ে পুরোনো কাপড় পাওয়া গেছে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে, নতুন পাথরের যুগের জলাবাসে। কাপড়টার বয়স হবে অন্ততঃ ৪০০০ বছর। কাপড়টা শণের তৈরি।

মানুষ প্রয়োজনের আঙিনা থেকে কাপড়কে আনল বিলাসের দরবারে। এবার আর সাদা-মাঠা কাপড় তৈরিই নয়। বুনটের মধ্যে এলো বিচিত্রতা, রং-চং ফুল, পাখি।

মিশরের দেয়ালে আর সিলিঙে যে সব নকসা আর চিত্র দেখা গিয়েছে তা তারা কাপড়েও তুলত। রাজা দ্বিতীয় অ্যামেনহোৎসের

কবর থেকে পাওয়া একটি কাপড় আগাগোড়া পদ্মফুল আর প্যাপিরাস-ফুলের বিচিত্র সমন্বয়ে চিত্রিত।

ব্যাবিলনের প্রাসাদভিত্তিতে চিত্রিত রাজারাজড়াদের দীর্ঘ আঁটসাট সুন্দর পোশাক এবং শিকার ও পশুপাখির নানা নকসায় ভরা বহুমূল্য কার্পেট আসীরিয়দের শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়। হারকিউলিস ও ওডিপাসের কাহিনী আঁকা বড় বড় কাপড় গ্রীসে পাওয়া গেছে। এগুলো অন্ততঃ ২০০০ বছরের পুরনো।

রোম বস্ত্রশিল্পে গ্রীসের অনুবর্তী। খৃষ্টপূর্ব দুই শতকে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে রোমানরা এত বাড়াবাড়ি শুরু করে যে রঙিন কাজ করা কাপড় আমদানি বার বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বাড়াবাড়িটা চরমে পৌঁছল সিল্ক আমদানি হবার পর। সিল্ক রোমে সোনার দরে বিকোত। আর এই সিল্ক শিল্পের রাজা ছিল চীন। চীন থেকেই প্রধানতঃ সিল্ক রপ্তানী হত। চীনের রেশমশিল্প এখনও দুনিয়ার সেরা। রেশমি সুতোর টানে চীনের সঙ্গে অনেক দেশই বাঁধা পড়েছিল, ভারতবর্ষ তো বটেই।

বস্ত্রশিল্পের আদিযুগে ভারতবর্ষও ছিল শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও ভারতে বিচিত্র বস্ত্র ও পরিচ্ছদের ব্যবহার ছিল। মধ্যযুগে, বিশেষ করে বাংলাদেশের তাঁতিরা সারা দুনিয়ায় নাম করেছিল। ফরাসী পর্যটক বের্নিয়ের মতে বাংলাদেশের সুতো ও রেশমের কাপড় এত বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হত যে এই রাজ্যকে কেবল হিন্দুস্থান নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির, এমন কি, ইউরোপেরও 'কাপড়ের আড়ত' বলা হত।

সেকালে পশম, রেশম, শণ বা তুলো ছাড়াও সৌখিন জিনিস বানাতে মাকড়সার জাল, মানুষের চুল এসব ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাস্‌বেষ্টসজাতীয় ধাতু ও পাথরের তন্তু দিয়েও কাপড় বোনা হয়েছে। আলেকজাণ্ডার জ্বলন্ত আগুনে সুন্দর একখানা ন্যাপকিন্ আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে অতিথিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ন্যাপকিন্ আগুনে পুড়ল না, কারণ ধাতু-তন্তুতে তৈরি। সিরিয়ার অ্যাস্‌বেষ্টস কাপড় চীনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এ থেকে আলোর পলতে তৈরি হত—এমন পলতে যা আর ক্ষয় হবে না—ভারি মজা! সৌখিন কাপড়ে সোনা আর রুপোর সুতো ব্যবহারের কথাও আছে বাইবেলে আর সেই সঙ্গে তাঁতিদের প্রশংসা।

জার্মান কবি গ্যেটে বলেছেন পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতশিল্পই হল সবার সেরা—যা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করতে পেরেছে।

সুতো-বোনাকে অনেক দেশের প্রাচীন কাব্যেই পবিত্র শিল্পকর্ম বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন লেখক রবার্ট গ্রেভ্‌স্-এর একটি রচনায় ওম্‌ফেল্ তার বন্ধু হেরাক্‌সস্‌কে বলছে সুতোকাটা শিখতে। সে বলছে:

'পৃথিবীতে সুতো-কাটার মত এমন তৃপ্তির কাজ আর নেই। আঙুলের ভাঁজে তুলোর পাঁজ। তকলি ঘুরছে—সবচেয়ে ভাল খেলনা যেন। বুন্‌তে বুন্‌তে গান গাও গুন্ গুন্ করে, গল্প করো স্বজনদের সঙ্গে আর মনটাকে ছেড়ে দাও নিরুদ্দেশের অঙ্গনে।'

এ তো আমাদের ঘরেরই ছবি।

বাস্তবে আমরা চাঁদে হানা দিচ্ছি, আর কল্পনায় শুনছি চাঁদের বুড়ির চরকার ঘর্ঘর্ আর গুন্গুন্ গান ঃ

চরকা আমার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি॥

চশমা

শ্রাদ্দবাড়ি। লোক এসেছে শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে। একজন প্রশ্ন করল ঃ যার ছেরাদ্দে খাইতে আইল্যাম তারে যে বড় দেহিনা ? অর্থাৎ যার শ্রাদ্ধে খেতে এলাম তাকে তো দেখছি না।

উত্তর হল ঃ সে তো মর্‌ছে।

—ক্যামনে মর্‌ল ?

—সর্প দংশনে।

—কোন্ অঙ্গে দংশন কর্‌ছিলো ?

—নাসিকাগ্রে।

—নাসিকাগ্রে ? যাউক। চক্ষু দুইড্যা তো বাচ্ছে। চক্ষু রত্ন মহারত্ন !

এ গল্পটা তোমরা হয়তো বড়দের মুখ থেকে শুনেছ। গল্পটা হাসির খোরাক জোগায় নিঃসন্দেহে। যে লোকটা মরেই গেল, তার চোখই বা কি আর কানই বা কি ? লোকটার মূর্খতায় আমরা যতই হাসি না কেন, চোখের প্রতি আমাদের যে অত্যধিক মমতাবোধ আছে সেকথাটা কিন্তু না মেনে উপায় নেই। আর এতো খুবই স্বাভাবিক। মানুষের কাছে চোখ যে কি জিনিস তা ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন হয় না।

'যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি ভরে উঠে সারা প্রাণ।'

কিন্তু এমন চোখের দৃষ্টি যদি অকালে ক্ষীণ হয়ে যায়। দেখবার আনন্দ, পড়বার আনন্দ, জানবার আনন্দ সব মাটি। এই দুর্ভাগ্য থেকে আমাদের রক্ষা করেছে চশমা।

চশমার আবিষ্কারের মূলে আছে কাচের আবিষ্কার। আশ্চর্য এক আবিষ্কার এই কাচ। কেউ কোন দিন ভাবতে পারেনি বালি চূণ সোডা আগুনে পোড়ালেই এমন অদ্ভুত ধরণের একটা চক্‌চকে স্বচ্ছ জিনিস তৈরি হবে। ঠিক কবে কোন্ দেশে কাচের আবিষ্কার হয়েছিল নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে এ আবিষ্কারের গৌরব সম্ভবতঃ মিশর আর মেসোপটেমিয়ার প্রাপ্য। প্রায় ৬০০০ বছর আগে এ দুই দেশে কাচ ব্যবহার হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্ত উন্নতির পথ খুলে দিয়েছে কাচ। কত রকমের কাজে যে কাচ লাগছে তার ইয়ত্তা নেই। দুখণ্ড কাচ চোখে উঠে এসে মানুষের দুর্বল দৃষ্টিকে সবল করে দেবে একথাও কেউ কোন দিন ভাবতে পারেনি। চশমা কোথায় আবিষ্কার হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে। কেউ বলে চশমা প্রথমে হয় চীনে, কেউ বলে আরবে।

প্রথম শতকে ঐতিহাসিক প্লিনি আতস কাঁচের কথা বলেছেন যা সূর্যের আলোয় ধরে সূর্যের উত্তাপ সংহত করে কোন কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়। প্লিনির সমসাময়িক সেনেকা (seneca) জানতেন যে একটা জলভরা কাঁচের বাল্‌বের মধ্যে দিয়ে দেখলে ছোট্ট অস্পষ্ট অক্ষরও বড় আর স্পষ্ট দেখা যায়। অবশ্য তিনি

জলকেই এর কারণ বলে ধরে নিয়েছিলেন। প্লিনি এক জায়গায় বলেছেন নীরো (Nero) নাকি চোখের সামনে মণি-মুক্তো গোছের কি একটা ছোট্ট জিনিস ধরে খেলা দেখতেন। সেটা লেন্স-জাতীয় কিছু কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করে জানবার কোন উপায় নেই।

সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রাচ্য দেশে কাচের জিনিসপত্র তৈরি হয়ে আসছে। এর মধ্যে কোন ছেদ পড়েনি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ৫-শতকের পরে কাচের কাজ প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। ১৩-শতকের এই কাচ-শিল্প আবার বেঁচে উঠল। অনেক গবেষণাও হল কাচের শক্তি ও গুণাগুণ নিয়ে। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন রোজার বেকন। অনেক বৈপ্লবিক মতের জন্যে তাঁকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। রোজার বেকন 'লেন্স" এবং লেন্সে আলো-চলাচলের অনেক রহস্য ভেদ করেন; লেন্সকে পড়বার কাজে ব্যবহার করেন। অনেকে বলেন, চশমা আবিষ্কারের প্রথম গৌরব রোজার বেকনেরই পাবার কথা। জিওর্দানো দা রিভাল্তো ১৩০৫ সালে একটি বক্তৃতায় কথা প্রসঙ্গে বলেন চশমা সম্ভবতঃ বছর বিশেক আগে আবিষ্কৃত হয়, তার মানে ১২৮৫ সালের কাছাকাছি একটা সময়ে। এই সময়টাতেই রোজার বেকন চশমা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ফ্লোরেন্সের একটি স্মৃতিস্তম্ভের লিপিতে সাল্ভিনো দেগ্‌লি আর্মাতিকে (মৃত্যু ১৩১৭) চশমার আবিষ্কারক বলা হয়েছে। আবার আলসেন্দ্রো দেল্লা স্পিনার (মৃত্যু ১৩১৩) সমাধিতে লেখা আছে আল্সেন্দ্রো নাকি চশমা বানাতেন এবং

চশমা বানানোর পদ্ধতি নাকি তিনি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। এমন হতে পারে এঁরা দুজনেই পৃথক্ ভাবে চশমা আবিষ্কার করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের একটি ইতালীয় গ্রন্থে সালভিনোকেই চশমার আবিষ্কারক বলা হয়েছে। আবার আলেকসান্দ্রো দেল্‌লা স্পিনার সমসাময়িক এক ঐতিহাসিক স্পিনাকেই চশমার আবিষ্কারক বলেছেন। কিন্তু ইউরোপেই চশমার আবিষ্কার সব চেয়ে আগে হয়েছিল কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সুং রাজবংশের চাও সি-কুর লেখায় চশমার উল্লেখ আছে। চাও সি-কু তাঁর লেখায় যে মূল গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন তা ১৩-শতকের শেষের দিকে লেখা! মধ্যযুগের চীনা ভাষার একটি অভিধানে বলা হয়েছে চীনে প্রথম চশমা এসেছিল মালাকস থেকে। কথাটি যদি ঠিক হয় তবে চীনে চশমা চালু হয়েছে ১৫-শতকে, তার আগে নয়।

চশমার আবিষ্কার পূবদেশেই হোক আর পশ্চিমের দেশেই হোক ১৩-শতকের শেষদিকে ইউরোপে চশমা তৈরি হয়। এবং ক্রমশঃ চশমার ব্যবহার বাড়তে থাকে ১৪-শতকের শুরু থেকে। ত্রেভিসোর একটি দেয়াল-চিত্রে চশমাপরা একটি পাদ্রীর ছবি আছে। ছবিটি ১৩৫২ সালের আঁকা। পাদ্রীর নাম হচ্ছে ডোমিনিকান কার্ডিনাল ইউখাল দি প্রেভেঞ্জোর। সম্ভবতঃ এটাই চশমাপরা লোকের সবচেয়ে পুরোনো ছবি।

ইউরোপের চশমা তৈরির কাজে অগ্রণী ছিল উত্তর ইতালী ও দক্ষিণ হল্যাণ্ড। ইতালীতে চশমাকে বলা হত occhiali, আর

হল্যাণ্ডে বলা হত brill or briller. দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের গৌরব হল্যাণ্ডের, আর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার লেন্স ও চশমা নিয়ে গবেষণার ফল।

১৩-শতকের চশমার আবিষ্কার ইউরোপের রেনাসাঁস (পুনরভ্যুদয়) এর যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে বিদ্যাচর্চা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রসারের মূলে, দৃষ্টিশক্তির সহায়ক এমন একটি আবিষ্কার নাহলে তার গতি অনেকটা রুদ্ধ হয়ে যেতো।



কনভেক্স (উত্তল) লেন্স



কনকেভ (অবতল) লেন্স

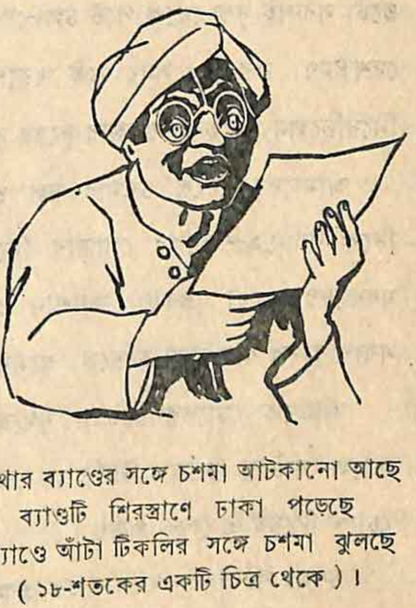
এরকম আরো অনেক লেন্স আছে।

আবিষ্কারের পর প্রায় ১০০ বছর ধরে চশমা মানে ছিল শুধু পিঠ-তোলা (convex) লেন্স দিয়ে বানানো ছোট হরফকে বড় করে দেখানোর একটি যন্ত্রমাত্র।

প্রথম দিককার চশমার ফ্রেম তৈরি হত কাঠ, শিং, স্টীল বা সোনা রুপো দিয়ে। লেন্সগুলো হত গোলাকার। দুটো রিমেরই মাঝামাঝি বা ওপরেরদিককার জায়গা থেকে একটু বাড়তি অংশ বেরিয়ে থাকত। এই অংশ দুটোকে কব্জারমত জুড়ে দেওয়া হত। ভাঁজ করলে একটা লেন্সের ওপর আর একটা লেন্স পড়ত,

আর খুললেই এই বাড়তি জোড়া-অংশটুকু নাকের ওপর একটা সেতুর মত কাজ করতো।

কিন্তু নাকের ওপর রাখা কঠিন হত এই ধরণের চশমা, হয় হাত দিয়েই ধরে রাখা হত আর না হলে মাথার ওপরে ব্যাণ্ড দিয়ে তারসঙ্গে আর একটি অবলম্বন দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। এখন যেমন চশমার দুই রিমে দুটো ডাঁটি লাগিয়ে কানের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয় তখন তেমন হত না। সেকথা কারো মাথাতেই আসে নি।



মাথার ব্যাণ্ডের সঙ্গে চশমা আটকানো আছে
ব্যাণ্ডটি শিরস্ত্রাণে ঢাকা পড়েছে
ব্যাণ্ডে আঁটা টিকলির সঙ্গে চশমা ঝুলছে
(১৮-শতকের একটি চিত্র থেকে)।

১৬-শতকে চশমাকে এক সময়ে টুপির সংগেও আটকে রাখা হত। একজন স্পেন-দেশীয় লোক মন্তব্য করে-ছিলেন—শুধু রাজকুমারদের পক্ষেই টুপির সঙ্গে বাঁধা চশমা ব্যবহার করা সম্ভব, কারণ তাদের তো আর কাউকে 'স্যাল্যুট' করবার দরকার হয় না। ক্রমে চশমা নাকের ওপর চেপে রাখবার সুবিধার জন্যে চামড়ার ব্যবহার হয়, এবং আরও পরে স্প্রিঙের ব্যবহার হয় নাকটাকে চিপটে ধরে রাখবার জন্যে।

১৭-শতকে চশমায় বিভিন্ন ধরণের লেন্স ব্যবহার করে চশমার উপযোগিতা বাড়াবার চেষ্টা হয়। ১৮-শতকে ইংলণ্ডে যাঁরা

দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং তদনুযায়ী উন্নত ধরণের চশমা বানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডোলাণ্ড, র‍্যাম্‌স্‌ডেন, পিয়ার্স এবং অ্যাডাম্‌স্‌ উল্লেখযোগ্য। ১৮-শতকের শেষদিকে বাই-ফোকাল লেন্সের চশমা ব্যবহার হয়েছে ইংলণ্ডে। এ ধরণের চশমায় লেন্স দুইটির প্রত্যেকটি দুইটি অংশে বিভক্ত, একটিতে কাছের জিনিস ভাল দেখাবার, আর একটিতে দূরের জিনিস ভাল দেখাবার জন্যে। চিত্র-শিল্পীরা এ ধরণের চশমা ব্যবহার করতেন কারণ তাঁদের চোখ দুটো সর্বদাই দৃশ্য থেকে পটে চলা-ফেরা করে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দেশভ্রমণ করবার সময় এই ধরণের দুই-লেন্সের চশমা বানিয়ে নিয়েছিলেন কাছের দৃশ্য আর দূরের দৃশ্য ভাল দেখবার জন্যে।

আমাদের দেশে চশমার চল হয় সম্ভবতঃ ১৮-শতকের শেষের দিকে বা ১৯-শতকের গোড়ার দিকে। চশমাটা প্রথমের দিকে যুবকদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চশমা-পরা নব্যবাবুদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে অনেক রচনায়, ছড়ায়, গানে।

আজকে চোখের চিকিৎসা যুগান্তর এনেছে। সেই সঙ্গে সমান-তালে ঘটেছে চশমার উন্নতি। তোমরা হয়তো কেউ কেউ চশমা-চোখে দিয়েই এ লেখা পড়ছ।

চশমা পরবার সখ বোধ হয় একটু আধটু সকলেরই—ছোটদের তো খুবই। খুদে-বাবুরা মেলায় গিয়ে আর কিছু কিনুক না কিনুক চারপয়সায় গ্যাটাপার্চারের রঙিন চশমা চোখে দেবেই, তারপর ভারিক্কি চালে এদিকে ওদিকে চাইতে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি শোনো। গল্পটা বলছি উপেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতি কথা' থেকে। একটু সংক্ষেপে বলছি, তবে তাঁর কথাতেই ঃ

'প্রভাস (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেজো ভাই) চশমার জন্যে অনেকের নিকটেই দরবার করতে লাগল। কিন্তু কেউ গা-গোছ করে না। হতাশ হয়ে হয়ে অবশেষে সে অহিংস উপায় পরিত্যাগ করে হিংস্র উপায়ের শরণাপন্ন হল। কেউ হয়ত সামান্য একটু ঝাপসা আলোয় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে চলেছে, হঠাৎ প্রভাস শক্ত মাথা নিয়ে একেবারে তার নাকের উপর গিয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নাক চেপে ধরে গেছি গেছি বলে সে বেচারা চীৎকার করে উঠল। অম্লানমুখে প্রভাস বললে, 'তা কি করব, আমি কি চোখে দেখতে পাই?'—এইধরণের উৎপাত দিনের পর দিন বেড়েই চলল। অবশেষে একদিন পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে ডেকে বললেন, প্রভাসের চোখ ভারি খারাপ হয়েছে, ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবুকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমার ব্যবস্থা কর।—দুজনে গুটি গুটি হাসপাতালের পথে অগ্রসর হলাম। দুই চক্ষুর আসন্ন অলঙ্করণের চিত্র মানস-মুকুরে দর্শন করে মনে হল, প্রভাস বেশ সপুলক চিত্তে চলেছে। আমিও যে প্রভাসের আগত-প্রায় সৌভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রে মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিত হইনি, তা বলতে পারিনে।

হাসপাতালে পৌঁছলাম। লম্বা এক লাঠির সাহায্যে ইংরাজী বোর্ডের চতুর্থ লাইনের একটা অক্ষর দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন্ অক্ষর বল্? ধরা যাক এ অক্ষরটা '**P**', কিন্তু

প্রভাস ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বল্লে 'S.' তৃতীয় লাইনের গোটা তিনেক অক্ষর নিয়ে নিমাইবাবু পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ফল একই হল, কোনটাই প্রভাস বলতে পারল না। তখন দ্বিতীয় লাইন টপকে নিমাইবাবু একেবারে প্রথম লাইনে গিয়ে পড়লেন। প্রথম অক্ষর একটা বৃহৎ সাইজের E ; সেটার উপর লাঠি ফেলে বললেন, বল্ এটা কোন্ অক্ষর ?—একমাত্র অন্ধ ছাড়া সকলেরই বলবার কথা। প্রভাস কিন্তু দেখে দেখে বলে বসল 'O'। নিমাইবাবু বললেন, ঠিক, বারান্দায় চল্। আমি ভাবলাম, না! প্রভাসটা নির্ঘাৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। চশমা তার কে মারে! কম্পাউণ্ডের কাছেই একটা কালো রঙের গরু চরছিল। বারান্দায় এনে গরুটাকে দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কি চরছে বল ?

ভাবলাম, এটা ত প্রভাস বলবেই, কিন্তু তাতে ওর কোন ক্ষতি হবেনা। প্রভাস হয়তো আমার চেয়েও সতর্কপ্রকৃতির মানুষ ; গরুটাকে দেখে বললে, ঘোড়া। যাঁহাতক বলা ঘোড়া, এক বিরাশী শিক্কা ওজনের চড়ের শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহগর্জন, বল্ কি ওটা ? ইঞ্চিছয়েক নীচু হয়ে গিয়ে আর্তকণ্ঠে প্রভাস বলে উঠল, 'গরু, গরু, গরু।' চক্ষু পরীক্ষার ঘরে প্রভাসকে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবু পুনরায় প্রভাসের চক্ষু পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। চড়ের কল্যাণে প্রভাস দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিল। ছোট, বড়, মাঝারি—সব অক্ষরই সে যথাযথ বলে গেল।

আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিমাইবাবু বললেন, বাড়ি যা

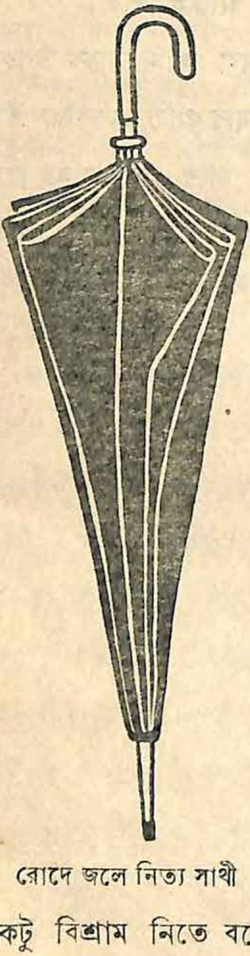
তোরা। মহেন্দ্রবাবুকে বলিস, ওর চোখ বেশ ভাল আছে।

আবার আমরা গুটি গুটি বাড়ির পথে পা চালালাম। ঘটনার শোচনীয়তা আমাদের ছুজনকে নির্বাক করে তুলেছিল।—সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, সামনেই ছট্ পরব আসছে প্রভাস। ছট্টের মেলায় চার আনা দিয়ে একটা সাদা কাঁচের চশমা কিনে মাঝে মাঝে লুকিয়ে পরিস। দামটা না হয় আমিই দোব।

প্রভাস আমাকে ভুল বুঝলে, মনে করলে আমি তাকে উপহাস করছি। কোন উত্তর না দিয়ে শুধু আমার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টির অর্থ—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না। সে যাই হোক, সেদিন থেকে আমাদের বাড়ির লোকজনের নাক আর চাকরদের গঙ্গাজলে-ভরা ঘড়া আবার নিরাপদ হল'।

ছাতা

জমদগ্নি মুনি শরক্রীড়া করছিলেন। তীর ছুঁড়ছিলেন একটা কিছু লক্ষ্য করে, আর তাঁর স্ত্রী রেণুকা দূরে গিয়ে তীর কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনছিলেন। দুপুর বেজে গেল, কিন্তু জমদগ্নি ক্ষান্ত হলেন না, তীর ছুঁড়েই চললেন। একটা তীর দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেল। তীর আনতে গিয়ে রেণুকা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, বসে পড়লেন স্নিগ্ধ বটের ছায়ায়। তীর ছুঁড়বার জন্যে জমদগ্নির হাত নিস্‌পিস্ করছে। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছেন রেণুকার উপরে: এত দেরী! বেশ কিছুক্ষণ পরে তীর নিয়ে রেণুকা এলেন স্বামীর কাছে। জমদগ্নি অগ্নিশর্মা হয়ে বল্লেন, 'এতো দেরী হল কেন, শুনি?' রেণুকা শ্রান্ত কণ্ঠে বল্লেন, 'আমার দোষ নেই, প্রভু। আগুন ঢালছে সূর্য। মাথা পুড়ে যাচ্ছিল, পা পুড়ে যাচ্ছিল তেতে-ওঠা মাটিতে। একটু বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম বটের ছায়ায়।' জমদগ্নি বুঝলেন



রোদে জলে নিত্য সাথী

আসল অপরাধী সূর্য, তিনি রেগে গেলেন সূর্যের উপরে। ঠিক করলেন সূর্যকেই বাণবিদ্ধ করবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বাণ তুললেন সূর্যের দিকে। এমন সময় সূর্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জমদগ্নির কাছে এসে কাতরকণ্ঠে বল্লেন, 'দোহাই আপনার, সূর্যকে রক্ষা করুন। সূর্যের কৃপাতেই তো পৃথিবীর সব সম্পদ।' জমদগ্নি বল্লেন, 'তুমিই যে আসলে সূর্য তা আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমার তাপ থেকে যারা আত্মরক্ষা করতে চায় তাদের উপায় হবে কি? সূর্য তখন দুটি জিনিস জমদগ্নিকে দিলেন। তার একটি হল ছত্র আর একটি পাদুকা। দিয়ে বল্লেন, 'মাথায় তাপ লাগলে মানুষ ব্যবহার করবে ছত্র আর পায়ে তাপ লাগলে পরবে পাদুকা। ছত্র এবং পাদুকা দান পৃথিবীতে পুণ্যকর্ম বলে গৃহীত হবে।'



অ্যাণ্ডো হিরোশিজের (১৭৯৭—১৮৫৯) আঁকা ছবিতে রকমারি ছাতা

এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে ধরা পড়ে ছাতা আবিষ্কারের মূল রহস্য। সত্যিই, সূর্যের খরতাপ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই প্রথমে ছাতা তৈরি করেছিল পূবদেশের মানুষ। বৃষ্টির কথা ভেবে প্রথমে ছাতা তৈরি হয় নি। ইংরেজী Umbrella কথাটার মূলে

আছে Umbra, মানে ছায়া। গ্রীষ্মপ্রধানদেশের ছায়া-কাঙাল মানুষ ছাতা তৈরি করেছে। ছাতার একটি সংস্কৃত নাম 'ছায়া-মিত্র'। ইংরেজী Umbrella কথাটির সঙ্গে এর আত্মীয়তা আছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে ছাতার ব্যবহার চলে আসছে। মিশর ও নিনেভের ভাস্কর্যে ছাতার ছবি পাওয়া গেছে।

তিন হাজার বছর আগে চীনদেশে ছাতার ব্যবহার ছিল। পূবদেশে ছাতা প্রথমে ছিল রাজকীয় বস্তু। ভারতবর্ষে ছত্র বলতেই ছিল রাজছত্র। একচ্ছত্র আধিপত্য কথাটাও ছত্রের রাজকীয়তা ঘোষণা করছে।

ইউরোপে ছাতা এলো পূবদেশ থেকে। প্রথমে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছাতার চল ছিল। ১৮-শতকে ছাতা রোদ ও বৃষ্টি-দুটোর হাত থেকেই রক্ষা পাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। ফরাসীদেশেই কেবল রোদের-ছাতা আর বৃষ্টির-ছাতার আলাদা আলাদা নাম আছে। পারাসল (parasol) হচ্ছে রোদের-ছাতা আর পারাপ্লুই (parapluie) হচ্ছে বৃষ্টির-ছাতা।

১৮-আর ১৯-শতকে ছাতার রাজত্ব পৃথিবী জুড়ে। ইউরোপে প্রথমদিকে ছাতা তৈরি হত চামড়া দিয়ে। বেশ শক্তসমর্থ লোকই ছাতা বইতে পারত। ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে যে ছাতার ব্যবহার ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপির একটি চিত্রে—প্রভু চলেছেন পথে, মাথায় ছাতা ধরেছে ভৃত্যে। কিন্তু আশ্চর্য, এর পর ১৭-শতক পর্যন্ত ইংলণ্ডে আর ছাতার ব্যবহার ছিল না। দীর্ঘদিন পরে, ১৭৫০ সালে

জোনাস হ্যানওয়ে নামে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পথে ছাতা নিয়ে বেরুলেন। তুমুল হৈচৈ হল তা নিয়ে। কিন্তু হ্যানওয়ের দৃষ্টান্ত কেউ অনুসরণ করল না। বাহবার বদলে হ্যানওয়ে পেলেন ছি-ছি। দমে গেলেন হ্যানওয়ে। ছাতা নয়, মাথা বাঁচানই দায় হয়ে উঠল তাঁর।

ইংলণ্ডে ছাতাকে জনপ্রিয় করে তোলবার ব্যাপারে জন ম্যাক-ডোনাল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৭৭৮ সালে তিনি একটি সুন্দর সিল্কের ছাতা নিয়ে পথে বেরুলেন। এবারেও হৈচৈ হল খুব। ছাতার বিরুদ্ধে তখনও ইংলণ্ডের জনমত প্রবল। ম্যাক-ডোনাল্ডের নিজের বোনই দাদার কাণ্ড দেখে লজ্জায় মরে গেলেন! ম্যাক-ডোনাল্ড দমলেন না; ছাতা ছাড়লেন না কিছুতেই। বছরখানেক পরে ধীরে ধীরে ছাতা চালু হল ইংলণ্ডে।



অ্যাংলোস্যাকসন যুগের ছাতা

ফরাসী দেশেও ১৮-শতকের মাঝামাঝি ছাতা খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু ছাতা ব্যবহার সেখানে আভিজাত্য-বিরোধী বলেই ধরা হত। বড়লোকেরা বলত, 'যাদের গাড়ি নেই, ছাতা ব্যবহার শুধু তারাই করে।' এখন ফরাসীদেশে রোদের-ছাতা শুধু মেয়েরাই ব্যবহার করে, বৃষ্টির-ছাতা অবশ্য মেয়ে পুরুষ সবাই।

১৯-শতকের প্রথম ২৫-৩০ বছরে ছাতার ভার কমাবার চেষ্টা হয়েছে। হাড়ের ফ্রেমের বদলে ধাতুর ফ্রেম ব্যবহার করার ফলে

ছাতার ওজন দশ পাউণ্ড থেকে নেমে এলো মাত্র দেড়পাউণ্ডে। ১৮৫০ সালে স্যামুয়েল ফক্স ইংরেজী অক্ষর 'U' এর আকারে স্টীলফ্রেম চালু করলেন। এতে ছাতা হাল্কা এবং টেকসই হল।

কোন দেশে ছাতার ব্যবহার কম হবে না বেশি হবে তা নির্ভর করে সে-দেশের জলবায়ুর উপরে। গ্রেটব্রিটেনের মত অনিশ্চিত আবহাওয়ার দেশে ছাতার প্রচলন বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ জাপানেও ছাতার ব্যবহার বেশি। এখানেও দুরকমের ছাতা, রোদের-ছাতা আর বৃষ্টির-ছাতা—বাঁশের কঞ্চি আর অয়েল-পেপার দিয়ে তৈরি।

তিব্বতের লামা আমাদের বাংলাদেশের বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দীপঙ্কর যখন তিব্বতে 'গুজে' নামে এক জায়গায় পৌঁছলেন (১০৫০) তখন শাদা-পোশাক পরা একশত রাজপুরুষ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিল ছোট ছোট নিশান এবং শাদারঙের কুড়িটি ছাতা। তিব্বতের এক মঠের গায়ে অতীশের এই অভ্যর্থনার ছবি আঁকা আছে।

ছাতার রূপ ও রূপান্তর জাপানে আর চীনের চিত্রকলা থেকে বেশ ভালোভাবে বোঝা যায়, কারণ চীন আর জাপানের শিল্পীরা বৃষ্টির অসংখ্য দৃশ্য এঁকেছেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন ভাস্কর্যে ছাতার চিত্র আছে। আমাদের দেশে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে ছাতাকে বৃষ্টি, রৌদ্র, বায়ু ও হিম নিবারক এবং 'চক্ষুর উপকারক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং

ছাতাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা করা হয়েছেঃ বিশেষ ও সামান্য। 'বিশেষ' হচ্ছে রাজার আর 'সামান্য' হচ্ছে সাধারণের। ছাতাকে সদণ্ড ও নির্দণ্ড হিসেবেও দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। সদণ্ড ছত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ যা সংকোচ ও বিকাশ করা যায়। অর্থাৎ খোলা যায় আবার গুটিয়েও রাখা চলে। আমাদের দেশে এখনও নির্দণ্ড ছাতার গ্রাম্য সংস্করণ হচ্ছে 'মাথাল' যা গ্রামে চাষীরা ব্যবহার করে। মাথাল সাধারণতঃ পাতা দিয়ে তৈরি হয়।

আমাদের দেশে ছাতা এক সময়ে পোশাক পরিচ্ছদেরই অঙ্গ হয়ে পড়ে। এখনও সম্ভবতঃ আমাদের দেশেই ছাতার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। পাশ্চাত্যদেশে টুপি এবং রেনকোট ছাতার প্রয়োজনকে কাটিয়ে ওঠে। আমরাও এখন বর্ষাতি ব্যবহার করি বৃষ্টি-বাদলার দিনে। রোদ এবং বৃষ্টির প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার নানা ধরণের পরিচ্ছদ তৈরি হলেও কিন্তু বেশির ভাগ দেশেই ছাতার অল্পবিস্তর চল আছে। তবে আধুনিক জীবনের উপযোগী হয়ে ওঠবার জন্যে ছাতার কিছু কিছু রূপান্তর ঘটছে। ভাঁজ করে একেবারে পকেট বা ব্যাগে পুরে চলবার মত ছাতাও কোথাও কোথাও ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্যারাসুটের চেহারাটা অনেকটা ছাতার মত হতে পারে, কিন্তু দুটো জিনিসের ব্যবহারে যে কোন মিলই নেই তা তো আজকে ছোট্ট ছেলেটিও জানে। কিন্তু ছাতার ব্যবহার ১৮-শতকে অনেকেই ঠিকমত জানত না। জেনারেল বারনভিঁয়ে ছাতার ব্যবহার ঠিক জানতেন না। তিনি ছাতাকে প্যারাসুটেরই নিকট-আত্মীয় বলে মনে করেছিলেন। ১৭৯৩ সালে একটা দুর্গ থেকে পালাতে গিয়ে

চল্লিশ ফুট উঁচু জানলা থেকে তিনি নিচে লাফিয়ে পড়লেন ছাতা ফুটিয়ে। অনিবার্য নিয়তি! ঠ্যাং ভাঙলেন দুটোই। ছাতা প্যারাসুটের সঙ্গে কোন কুটুম্বিতাই স্বীকার করল না।

একবার একজন সাহেব বন পথে যেতে যেতে হঠাৎ বাঘ সামনে দেখে হকচকিয়ে গিয়ে ছাতা ফুটিয়েছিলেন। বাঘটি সভয়ে পালিয়েছিল! বাঘটা ছাতা চিনত না। কারণ ছাতার চলও হয় তো তার রাজত্বে ছিল না। আজকের বাঘেরা অনেক চালাক। আমরা হয়তো ছাতার আকস্মিক বিস্ফারণে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাব না, তবে বাঘাড়ে রোদের হাত থেকে রক্ষা পাব এ কথা নিশ্চিত।

ছাতার মর্যাদা আমরা বুঝি। কিন্তু আমাদের মাথার মর্যাদা কি ছাতা বোঝে? বোঝে না। তাই সে গজর গজর করে মাথাকে বলে ঃ

তুমি যাবে হাটে মাঠে দিব্য অকাতরে
রোদ-বৃষ্টি যত কিছু সব আমা'পরে।
তুমি যদি ছাতা হ'তে কি করিতে দাদা?

এর উত্তরে মাথা কি বলে তা তোমরাই বলো।

